ভাদ্র, ১৩৮৭

ঝলমল

ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা ঝলমল





পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : স্বপ্না বিশ্বাস - স্ক্যান করেছেন : সুমন বিশ্বাস

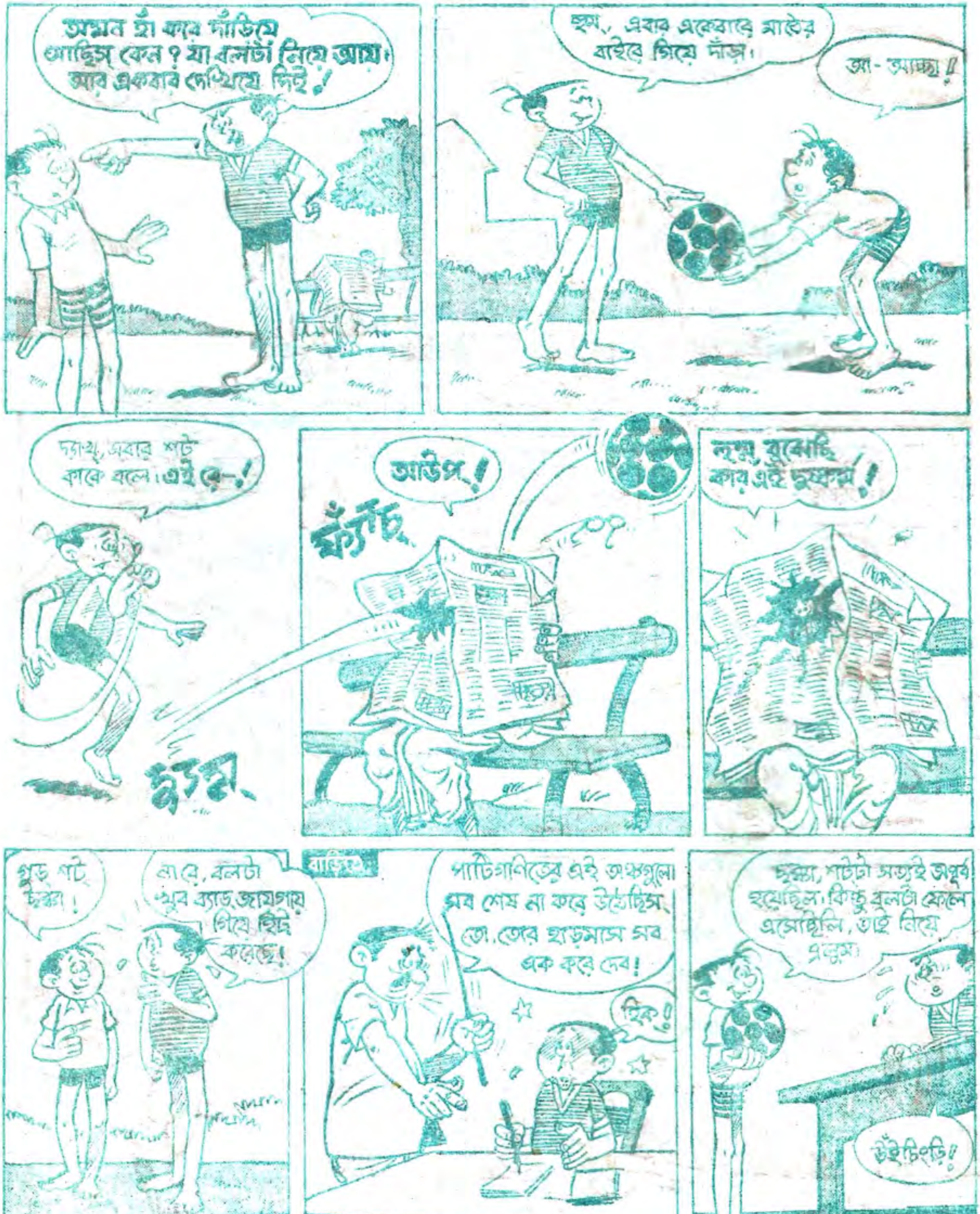
এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।



হুক্কা ফক্কা
দিলীপ দাস
মাঠে একটু ফুটবল প্র্যাকটিস করি গে। আজ তোকে কয়েকটা নতুন ট্যাকটিকস শিখিয়ে দেব।
এই শটটা আমি পেলের কাছ থেকে শিখেছিলুম।
প্রথমে বলটা ঠিক জায়গা মত বসিয়ে নিবি। তারপর—
বাঁ পায়ে একটু ড্রিবল করে ডান পায়ে সজোরে কিক—
গুম্
গ্যাওক!
কঁক!
হতচ্ছাড়া, বুদ্ধু কাঁহেকা! অমন দুর্দান্ত শটের মুখে কেউ বোকার মত দাঁড়ায়?
তু-তুই তো তখন আমাকে কিছু বললি না!


অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? যা বলটা নিয়ে আয়। আর একবার দেখিয়ে দিই!
হুম, এবার একেবারে মাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়া।
অ্যা-অ্যাচ্ছা!
দ্যাখ্, এবার শট কাকে বলে। এই রে—!
ধুপ্প্
আউঃ!
ফ্যাঁচ্
বুঝেছি কার এই দুষ্কর্ম!
গুড় শট্, ছক্কা!
না রে, বলটা খুব ব্যাড জায়গায় গিয়ে ছিট্রি করেছে!
পাটিগণিতের এই অঙ্কগুলো সব শেষ না করে উঠেছিস তো, তোর হাড়মাস সব এক করে দেব!
হিক!
হুক্কা, শটটা সত্যিই অপূর্ব হয়েছিল। কিন্তু বলটা ফেলে এসেছিলি, তাই নিয়ে এলুম।
উঁইচিংড়ি!

হীরা-মানিক জ্বলে

কাহিনী-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি - গৌতম কর্মকার।




অন্ধকার নেমে আসছে। কাছাকাছি কেউ নেই। লোকটা গুন্ডা নয়তো? ওকে বিদায় করবার জন্য সুশান্ত দু' আনা পয়সা দিল।
এই নাও।
লোকটা কিন্তু গেল না।
বাবুজী, আপনাকে দেখলে বড় ঘরের ছেলে মনে হয়। লেখাপড়াও জানেন। আচ্ছা, আপনি পুরনো লেখা পড়তে পারেন বাবুজী?
কি লেখা?
লোকটা একটু এদিক-ওদিক তাকালো।
আজ না বাবু, কাল বলবো। কাল একবার এখানে আসবেন মেহেরবানী করে?
তুমি কোথায় থাক?
মেটেবুরুজে বাবুজী। জাহাজে কাজ করতাম, এখন কাজ নেই।
জাহাজে কতদিন কাজ করেছ?
দশ বছরের বেশী। সব দেশে গিয়েছি পৃথিবীর। জাপান, ইংলন্ড, জাভা, সুমাত্রা-সব জায়গায়। এই ঘুরতে ঘুরতেই একটা অদ্ভুত জিনিস পাই বাবুজী। তবে সে কথা আজ নয়, কাল বলবো।
G.Karmakar

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION,
WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE
VIDE, NO. 443/16 (2) T.B C. (Dated 4th December, 1979)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ছক্কা ফক্কা—দিলীপ দাস	১
২। হীরা-মাণিক জ্বলে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
৩। দেশের মাটি—গোপালী নন্দী	৭
৪। মহাভারতে ঘনাদা—প্রেমেন্দ্র মিত্র	৮
৫। গ্রীনল্যাণ্ডে টারজান—ননীগোপাল আইচ	১১
৬। ডাকাত সর্দার করালী—প্রিয়রঞ্জন মৈত্র	১৩
৭। একটি অভিযান—জগদীশ দাস	১৭
৮। শিবাজী ব্যানার্জীর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা—পার্থপ্রতিম সিংহ	২১
৯। মনজয়ী নাম মজিদ—দুর্বার গঙ্গোপাধ্যায়	২২
১০। সেণ্ট মার্গারেট স্কুলের সেরা সাঁতারু—লীনা মিত্র—পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী	২৪
১১। সুপার স্টার বথাম—উমাশংকর বসু	২৫
১২। মনের জোরে ফিরে আসা—সৌমিত্র ঘোষ দস্তিদার	২৭
১৩। তিন প্রধানের তিন সেরা—দেবাশিস দত্ত	২৮
১৪। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—মানস ভট্টাচার্য	৩০
১৫। হকি-সোনা—সুধীরকুমার সেনগুপ্ত	৩২
১৬। স্বপনবুড়োর চিঠি	৩৩
১৭। মজার ম্যাজিক—যাদুসম্রাট এ. সি. সরকার	৩৫
১৮। মজার ধাঁধা—	৩৬
১৯। অন্ধকারে সবুজ আলো—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৭
২০। পাখি থেকে হাতি—আশাপূর্ণা দেবী	৪১
২১। ইস্টবেঙ্গলের মনোরঞ্জন—পার্থসারথি দত্ত	৪৩
২২। সুখ তার সইল না—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫

২৩। মশা ধরা—মতি মুখোপাধ্যায় ৪৬
২৪। চিল ঘট-ঘটাং এবং মৌবন্দী—হরপ্রসাদ মিত্র ৪৭
২৫। বিভূতিভূষণ ও কয়েকটি অসাধারণ ঘটনা—দেবীদাস চট্টোপাধ্যায় ৪৯
২৬। দুই বিড়ালী কথা—সুকুমার ভট্টাচার্য ৫১
২৭। মিরিক বেড়িয়ে এলাম—সুব্রত দে ৫২
২৮। ক্যাঙারুর আত্মপ্রকাশ—নীল সেন ৫৩
২৯। ওলিম্পিকে স্বর্ণজয়—রূপক চট্টোরাজ ৫৫
৩০। ময়দানবের কল—সিদ্ধার্থ ঘোষ ৫৬
৩১। আলো জ্বালাও—করুণাময় বসু ৫৭
৩২। পিওন ভূত—বিদ্যুৎ মল্লিক ৫৮
৩৩। পশু হলেও সে মা—সৌরেন্দ্রকুমার পাল ৬১
৩৪। ভূত-পেত্নী কোথায় নেই—নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩
৩৫। আমাদের চারদিক—অসিতকুমার চক্রবর্তী ৬৬
৩৬। সবই কি অন্ধবিশ্বাস— শ্রীধর সেনাপতি ৬৭
৩৭। বুদ্ধির্যস্য—দীপংকর রায় ৬৯
৩৮। ভারতবর্ষ নাম হল কেন—মল্লিকা মুখোপাধ্যায় ৭১
৩৯। চোখ বুজে এ কী দেখলাম—চন্দনা দত্ত ৭২
৪০। এ তো শুধু গল্প নয়—প্রদীপকুমার চক্রবর্তী ৭৩
৪১। অবিশ্বাস্য—নারায়ণচন্দ্র দণ্ড ৭৫

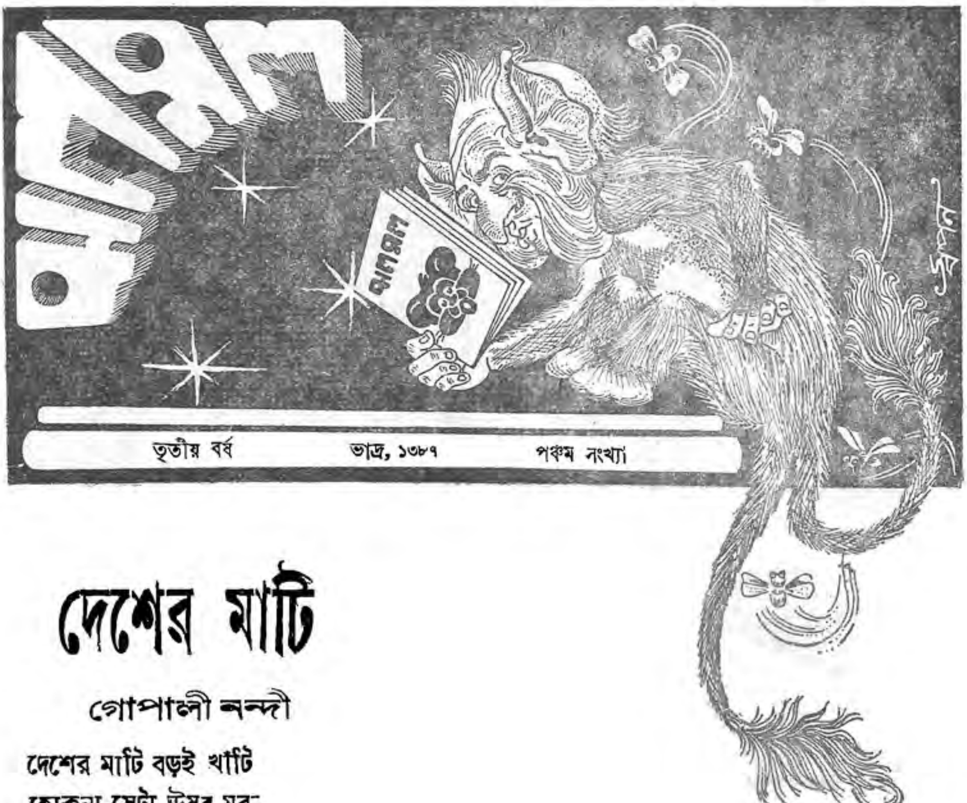
বিভিন্ন জেলায় আমাদের এজেন্ট

১। অজিত মণ্ডল, যুগান্তর এজেন্ট, বাঁকুড়া
২। অজিত কুমার দাশ, বোলপুর
৩। চয়নিকা, কুচবিহার
৪। ইকনমিক বুক স্টল, কলেজ রোড, শিলিগুড়ি
৫। সনৎ করাতি, গ্র্যান্ড হোটেল, বাঁকুড়া
৬। ভারতী পুস্তকালয়, বিষ্ণুপুর
৭। পণ্ডিত বুক স্টল, মেদিনীপুর
৮। রবীন্দ্র লাইব্রেরী, বালুড়ঘাট
৯। ম্যাগাজিন কর্ণার, জলপাইগুড়ি
১০। কালিয়াচক বুক হাউস, কালিয়াচক
১১। মালদহ বুক কর্ণার, অতুল মার্কেট, মালদহ
১২। ব্যানার্জি পুস্তকালয়, সাঁওতালদিহি
১৩। বুক কর্ণার, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া
১৪। বাঁকুড়া নিউজ পেপার, বাঁকুড়া

সম্পাদকীয় কার্যালয়ঃ

১ রাজেন্দ্র দেব রোড (ঠনঠনিয়া কালী বাড়ির সম্মুখে)। কলি—৭০০ ০০৭। ফোন—৩৪-৭৮০৩।

শ্রীসিতাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রগতি প্রিণ্টার্স, ৭৫, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং পি-৪৬, নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কলি-৭০০ ০৫৪ হইতে প্রকাশিত। ভাদ্র সংখ্যাঃ মূল্য—১.৮০



তৃতীয় বর্ষ ভাদ্র, ১৩৮৭ পঞ্চম সংখ্যা

দেশের মাটি

গোপালী নন্দী

দেশের মাটি বড়ই খাঁটি
হোকনা সেটা উষর মরু,
বিদেশ তবু বিদেশ জেনো
থাকনা শস্য শ্যামল তরু।

সোনায় ঢাকা পাহাড়চূড়া
ছড়াক আলো উজ্জ্বল ধারা,
দেশের কালো কঠিন মাটি
সবার মনে দিকনা নাড়া।

ও ভাই কিশোর নবীন শিশু,
দেশকে আরো বাসবে ভালো,
একটি ধূলিকণাই দেবে
হাজার রবি-তারার আলো।





প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হদিস যা খুঁজছিলাম তা মিললও। আগস্টের পর আবার সেপ্টেম্বরের আর এক তারিখ পেলাম শিবুর জন্মদিনের। তারিখ এবার ২১শে সেপ্টেম্বর আর তার নিচে অতি সংক্ষেপে লেখা বড় পিসেমশাই-এর কাছে।

এই কটা তারিখ আর তার সঙ্গের লেখাগুলো দেখে যা সন্দেহ করেছি তা যে ভুল নয়--ঘরের সবকটা দেয়াল পরীক্ষা করে তারই প্রমাণ পেলাম।

হ্যাঁ, শিবুর জন্মদিন একটা নয় অনেক।

প্রত্যেক মাসেই একটা করে জন্মদিন আছে, কোনো কোনো মাসে দুটো এমন কি তিনটেও। কোন জন্মদিন কার কাছে তাও লেখা আছে জন্মদিনের তলায়।

এ সব লেখাগুলো যে শিবুর স্মারক-লিপি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কমপক্ষে অন্ততঃ পোনেরো ষোলোটা জন্মদিন মনে রাখতে সোজা কথা নয়। তার সঙ্গে আবার সে জন্মদিন কোনটা কোনটা কোন শাঁসালো গুরুজনের কাছে কিছু হাতাবার সে সবও ঠিক ঠিক মনে রাখা দরকার।

শিবুর বরাবরই আমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে একটু বেশী ট্যাঁক ভারী। তার উপরি স্বচ্ছলতার উৎসটা যে কোথায় তা এবার বোঝা গেল।

যে টেলিফোন নম্বর খুঁজতে এ ঘরে এসেছিলাম শিবুর গোটা পাঁচেক জন্মদিন বার করবার পরই সেটা পেয়েছিলাম। কিন্তু শিবুর জন্মদিনের পুরোপুরি রহস্যভেদ না করে সন্ধানটা ছাড়তে পারি নি।

এ সন্ধানের শেষে আসল ফোন নম্বরটা নিয়ে মেস ছেড়ে বার হতে বেশ একটু দেরী হয়ে গেল তাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা এখন হাসিল করবার চেষ্টা করতে হবে।

তার জন্যে সবার আগে দরকার একটা টেলি-ফোনের। বাহাত্তর নম্বরে আমাদের টেলিফোন নেই। সবচেয়ে কাছাকাছি টেলিফোন এখন পাই কোথায়? শুধু টেলিফোন থাকলেই হবে না। তা ব্যবহার করতে পারার সুযোগও চাই।

ভাবতে ভাবতে আমাদের বড় রাস্তার মিঠাইওয়ালা রামুর কথা মনে পড়ল। নিজেদের জন্যে যতটা না হোক ঘনাদার জন্যে আমরা তার দোকানের প্রায় প্রতি-দিনের বড় খদ্দের। সেখানে ফোন করবার কিছু বেশী সুবিধে পাব বলেই মনে হয়।

তা পেলাম ঠিকই। একটু আধটু নয়, একেবারে অবাধ অধিকার। দোকানের মালিক ফোন করবার সুবিধে দিতে ক্যাশের বাক্সসমেত তার গদি ছেড়েই উঠে গেলেন। ক্যাশবাক্সের সামনে একটু আড়ষ্ট হয়েই বসতে হল। তা ছাড়া ভিয়েনে চড়ানো সব খাবারের কড়া সুগন্ধে আর খদ্দের ও দোকানের লোকেদের কেনাবেচার গোলমালে মাথাটা তখন একটু ঝিমঝিমও করছে।

সেই অবস্থায় নিজেকে শক্ত করে ভবতারণবাবুর নম্বরটা ডায়াল করতে গিয়ে থামতে হল। ফোনটা তার আগেই বেজে উঠেছে।

একটু ইতস্ততঃ করে মালিক বা অন্য কাউকে কাছাকাছি না দেখে রিসিভারটা তুলে নিতে হল।

ওধারে বেশ ভারিক্কি গলা—হ্যালো রাধেশ্যাম মিঠাইওয়ালা ?

আপনা থেকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আজ্ঞে না, মানে হ্যাঁ।

না মানে হ্যাঁ, কি ?—ওধারের ধমক সেই সঙ্গে প্রশ্ন—কে আপনি,—মানে তুমি ?

আজ্ঞে আমি—আমি, কি বলে রাধেশ্যাম নই।—আমার বিনীত নিবেদন।

রাধেশ্যামকে দাও তাহলে।—ওধার থেকে কড়া গলার হুকুম।

ভুজি যাকে তাকে বেচা হয় না। আপনার হিঙের পারমিট আছে ?

হিঙের পারমিট ? ওধারে হতভম্ব গলার আওয়াজ।

হ্যাঁ, অন্ততঃ তিন রতির।—বলে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

ফোন নামাবার পরই একটু চমকাতে হল। রাধেশ্যাম মিঠাইওয়ালা তাঁর ভিয়েন ঘরে কিছু তদারকির জন্যে ঢুকেছিলেন বোধহয়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তখন জিজ্ঞাসা করছেন,—কার ফোন আসিয়াছিল বাবু ?

চমকে উঠে দু চার সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজেকে



কার ফোন আসিয়াছিল বাবু ?

আজ্ঞে দিচ্ছি।—বলে এদিক ওদিক চেয়ে মালিককে কোথাও দেখতে না পেয়ে রিসিভারটা একবার ক্যাশবাক্সর ওপর একটু ঠুকে রেখে আবার কয়েক সেকেণ্ড বাদে তুলে নিয়ে গলাটা যথাসম্ভব ভারী আর মন্থর করে বললাম—হ্যাঁ, বলুন কি বলছেন।

হ্যালো শুনুন। ওধারের বায়না,—লোক পাঠাচ্ছি। আমার জন্য পঞ্চাশটা হিঙের কচুরি আর···

এবার শোধ নেবার মৌকা। ওধারের কথার মাঝখানেই বললাম—হবে না।

হবে না !—ওধারের বিস্ময়।

না হবে না !—আমার সাফ জবাব,—এসব ভাজা-

সামলাতে হল। সুরুতেই ঢোক দু একটা গিলেছিলাম হয়ত কিন্তু দূর থেকে রাধু মিঠাইওয়ালার তা আশা করি চোখে পড়ে নি। বেশ একটু মজা পাবার সুর লাগিয়ে বললাম,—আরে শুনুন কথা! বলে কিনা সিমেণ্ট চাই। মিঠাইওয়ালার দোকানে সিমেণ্ট !

যে হাসিটা তারপর হাসতে যাচ্ছিলাম, তা শুরু হতে না হতে গলাতেই তারপর আটকে গেল বলা যায়।

বাবা এযে হিতে বিপরীত !

মিঠাই-এর দোকানে সিমেণ্টের কথা শুনে রাধেশ্যাম কোথায় আমার হাসিতে সুর মেলাবে, না ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে,—সিমেণ্ট চাহিতেছিল ! কেতো সিমেণ্ট ? কে ফোন করতেছিল, কে ? (ক্রমশঃ)



ননীগোপাল আইচ

[আগেকার কথা ঃ—একটা জাহাজ জাম্বেসী নদীর ধারে নোঙ্গর-করা ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন হেনরী রাত্রে ডেকে বসে চাঁদের আলোয় চারিদিকের শোভা দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি কাগজে-দেখা শুক্রযানের মতো একটা কিছুকে নদীর ধারে দূরের বনের মধ্যে নেমে পড়তে দেখলেন। তাঁর মুখ থেকে সেই কথা শুনে শুক্রযানকে দেখবার জন্যে জর্জ তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে বনের মধ্যে চলে গেলেন। তাঁরা শুক্রযানকে দেখতে পেলেন না। দু'জন কালো লোক ও একজন ফর্সা লোককে শুক্রযানের লোক ভেবে তাদের জাহাজে নিয়ে এলেন। জাহাজ পরে মাদাগাস্কারের পাশ দিয়ে মরিশাসে গিয়ে পৌঁছল। জাহাজের সকলে অতিথিভবনে উঠলেন। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী শিউ সাগর রামগুলাম শুনলেন, জাহাজের লোকেরা টারজানকে বন থেকে ধরে নিয়ে এসেছেন। তিনি টারজানকে দেখতে অতিথিভবনে গিয়েছিলেন। তাঁর বাসভবনে যাবার সময় চিড়িয়াখানা থেকে পালানো বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে টারজান আহত হল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। টারজান হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ক্যাপ্টেন হেনরী জাহাজ নিয়ে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে। সেখান থেকে গেলেন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে। টারজান ও তার দুই সঙ্গী জাহাজ থেকে পালিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হেনরী জাহাজ নিয়ে চলে গেলেন। পরে জাহাজ সালভাডর বিমানবন্দরে পৌঁছল। তারপর কুণ্ডা, গোমা ও টারজান বিমানে করে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে পেঁছিল।]

টারজান তো এই ধরনের ভিড় দেখে হতভম্ব। কেন এই ভিড় ?

গোমা রেগে টঙ। কুণ্ডাকে ভর্ৎসনা করে বলল, "তোমায় না বারণ করেছিলাম টারজানের নাম কোরো না। এ তুমি কী করলে ?"

কুণ্ডা গোমার ভৎসনায় একটুও না দমে হাসতে থাকল। তার হাসি দেখে গোমার মুখ-চোখ রাগে লাল হয়ে উঠলো।

ভিড় যখন ঘর ছাপিয়ে উঠেছে তখন সওদাগরী অফিসের ম্যানেজার দেখলেন বেগতিক। একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে ভিড়ের প্রচণ্ড চাপে ঘরের আসবাবপত্রের ক্ষতি হতে পারে। কাচের শার্শিগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে। তিনি অফিসের দরোয়ানদের ডেকে ঘরের লোকজনদের বাইরে বার করে দিতে বললেন।

দরোয়ানদের সে কাজ করা সহজে সম্ভব হল না। অনেক চেষ্টা করে তারা ঘরের ভিড় সরালে ম্যানেজার টারজানকে নিয়ে উপরতলায় চলে গেলেন।

নীচে থেকে একটা বড় গাছ উপরতলার ঘর ছাড়িয়ে উঠেছিল। টারজান খোলা জানালা দিয়ে সেই গাছের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘরের লোকেরা তাকে যেভাবে নানা প্রশ্ন করে বিরক্ত করে তুলছিল তাতে সে তাদের হাত থেকে এড়াবার জন্যেই গাছে গিয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া গাছপালা বনজঙ্গলই তার প্রিয়। কোঠাবাড়ি, মোজেক-করা মেঝে, কাচের জানালা, চেয়ার-টেবিল তার মোটেই ভাল লাগছিল না।

যে গাছে টারজান উঠেছিল, তার আশেপাশে আরো কতকগুলো গাছ ছিল। কুণ্ডা তাকে যত গাছ থেকে নেমে আসতে বলে ততই সে উপরে উঠে যায়। এক গাছ থেকে আর এক গাছে যায়।

সেই দৃশ্য দেখতে নীচে বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। কুণ্ডা-গোমা দেখল, টারজানকে নিয়ে তারা ভীষণ ফ্যাসাদে পড়ে গেছে।

সওদাগরী অফিসের ম্যানেজার ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করলেন। ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি নিয়ে এল। তারপর দু'ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে টারজানকে নীচে নামিয়ে আনল।

টারজানের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা রীতিমতো নাস্তানাবুদ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু টারজানকে একটুকু ক্লান্ত দেখায় নি। সে শান্ত লোকের মতো ম্যানেজারের সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে বসল।

শহরের বড় রাস্তায় বেড়াতে বেরোল। কদিন এখানে থেকে টারজানের শীত একটু গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তার পরনে পশমী প্যাণ্ট, গায়ে গরম জামা। সে তত শীত বোধ করছিল না। কিন্তু বার বার সে জামা খুলে ফেলতে চাইছিল। কুণ্ডা, গোমা দুজনেই তাকে অমন কাজ করতে মানা করল, বলল, ঠাণ্ডা লেগে তার জ্বর হবে। নিউমোনিয়াও হতে পারে।

বেড়াতে বেড়াতে তারা বিমান বন্দরের কাছে এসে পড়লো।

টারজানের চোখে পড়ল, একজন লোক একটা ফুটফুটে ছেলেকে কোলে করে চলেছে। ছেলেটাকে



টারজান খোলা জানালা দিয়ে······ঝাঁপিয়ে পড়ল। (পৃঃ—এগারো)

দেখে তার কেমন মায়া জন্মাল। সে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে কোলে নিতে চাইল। দু' হাত বাড়াতেই ছেলেটা এক গাল হেসে টারজানের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কথায় কথায় কুণ্ডা জানতে পারলো, লোকটা এক এস্কিমো সর্দার। সে শ্বেত ভল্লুক, সীল, মেরু শিয়াল, ক্যারিবু হরিণ প্রভৃতি জন্তুর লোমশ চামড়ার ব্যবসাদার।

গ্রীনল্যাণ্ডের গটহাবে তার বাড়ি। সে কানাডা ও উত্তর আমেরিকার নানা জায়গায় ওই সব জন্তুর চামড়া সরবরাহ করে।

ছেলেটি তার নাতি, তার খুব প্রিয়। কখনও কখনও সে তাকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ ঘুরে আসে। ছেলেটি এতে বেশ আমোদ পায়।

লোকটির নাম সীরেনসেন। ছেলেটির নাম এরিক।

দিনকয়েকের মধ্যে সীরেনসেনের সঙ্গে টারজানের বেশ ভাব জমে উঠলো। এরিককে টারজান প্রায় সব সময়ই কোলে করে নিয়ে ঘুরতে লাগল।

কুণ্ডা ও গোমা টারজানের ভাবগতিক লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল। তারা টারজানকে কখনও একটা ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে এমন তন্ময় হতে দেখে নি।

ম্যানেজারের এক বন্ধু সর্বক্ষণ এই দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁর একটা সার্কাস পার্টি ছিল। তাঁর খেয়াল হলো, টারজানকে তাঁর সার্কাস পার্টিতে যোগ দিতে রাজী করাবেন। সেইজন্যে তিনি কুণ্ডাকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে একরকম রাজী করালেন! গোমা অবশ্য সম্মত হল না, বলল, টারজানকে কোনক্রমেই সার্কাস পার্টিতে শান্তভাবে যোগ দেওয়ানো যাবে না। যদি বা একরকম জোর করে সার্কাসে খেলা দেখানোর কাজে লাগানো যায় তাহলে সে হয়তো হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। তাকে বাগ মানিয়ে চলবার সামর্থ্য কারো থাকবে না।

গোমার একান্ত জেদাজেদিতে কুণ্ডাকে সার্কাস পার্টিতে টারজানকে ভিড়িয়ে দেবার চেষ্টা থেকে বিরত হতে হল।

কুণ্ডা ভেবেছিল, তার ভাইয়ের কাছ থেকে এমন কিছু সাহায্য পাবে, যাতে বনের মানুষ টারজান চিরদিনের মতো শহুরে মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারবে। কিন্তু তার সে আশা সফল হল না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে কুণ্ডা, গোমা ও টারজান

[ক্রমশঃ]



প্রিয়রঞ্জন মৈত্র

অনেকদিন আগের কথা। তখন উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে করালী ডাকাতের নাম মুখে মুখে ফিরত। তার ভয়ে কাঁপত জমিদার-জোতদার মহাজনরা। কাঁপবে নাই-বা কেন ? করালীর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। আর সে সব কাহিনী তো তাদের নিয়েই। তবে দাবি মিটিয়ে দিলে নাকি অত্যাচার করত না করালী।

প্রথম দিকে চিঠিপত্তর দিয়ে হানা দিত করালী। এটাই ছিল তার বিশেষত্ব। কিন্তু পুলিসের বাধা পেয়ে চিঠিপত্তর দেওয়া ছেড়ে দিয়েছিল সে।

সবার আগে পুলিসকে জানিয়েছিলো সিংহগড়ের জমিদার নৃপতি রায়। যার ফলে সিংহগড়ে ডাকাতি করতে গিয়ে ঘা খেয়ে পালাতে হয়েছিল করালীকে। সেবার তার দলের একজন আহত হয়েছিল নৃপতি রায়ের বন্দুকের গুলিতে। অবশ্য তাকে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল করালীর দলের লোকেরা।

নৃপতি রায় ভেবেছিলেন আর কোনদিন হানা দিতে সাহস করবে না করালী।

কিন্তু কয়েকমাস যেতে না যেতে আবার হানা দিয়েছিল করালীর দল।

দ্বিতীয়বার হানা দেওয়ার কয়েকদিন আগে সিংহগড়ের হাটখোলার পাশের মাঠে তাঁবু ফেলেছিল একদল বেদে। তারা বাত ভালোর তেল থেকে শুরু করে দাঁতে পোকার ওষুধ পর্যন্ত বিক্রি করেছিল ঘুরে ঘুরে! তারপর একদিন বাত ভালোর তেল বিক্রি করতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল নৃপতি রায়ের অন্দরমহলে। তার মায়ের কাছে তেল বিক্রি করে টাকা নিয়ে চলে গিয়েছিল তারা।

তখন কেউই বুঝতে পারে নি ওই বেদের ছদ্মবেশধারী মানুষগুলোই আসলে করালীর দলের লোক। বাত ভালোর তেল বিক্রি করতে গিয়ে জমিদারবাড়ীর ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিল তারা।

পরদিন গভীর রাত্রেই হৈ-হৈ চিৎকারে জেগে উঠেছিল সিংহগড়ের মানুষ। দেখেছিল অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। ছোটাছুটি করছে এদিকে ওদিকে। ছাদে নীচে।

কিছু দুঃসাহসী মানুষ ছুটে গিয়েছিল জমিদারবাড়ির দিকে। কিন্তু গেটের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তারা। কারণ হঠাৎ তারা শুনতে পেয়েছিল রাত্রির আকাশ বিদীর্ণ-করা করালীর গুরু গম্ভীর গলা।

আমি করালী সর্দার বলছি — সা—ব—ধা—ন।

ওই একটি সাবধান শব্দেই পিছু হটেছিল মানুষগুলো, অন্ধকারেই ফিরে গিয়েছিল যে যার বাড়িতে।

পরদিন যখন সকাল হয়েছিল তখন জমিদারবাড়িতে ভেঙ্গে পড়েছিল গাঁয়ের মানুষ, দেখেছিল দুটি ঘরে আটক রয়েছে বাড়ির লোকজন। বাইরে থেকে শেকল তোলা সেই দুটি ঘরের। আর জমিদার নৃপতি রায় বাঁধা রয়েছেন দর দালানে। থামের সঙ্গে, তাঁর সর্বাঙ্গে চাবুকের দাগ। জ্ঞান নেই তাঁর।

অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর জ্ঞান ফিরেছিল নৃপতি রায়ের। জ্ঞান ফিরতেই বেদের দলের খোঁজ নিতে লোক পাঠিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু কোথায় সেই বেদের দল? খুঁজে পাওয়া যায় নি তাদের।

তখন আর কারো বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে ওই বেদের দলই আসলে করালী ডাকাতের দল।

কিন্তু ওই দলের মধ্যে কে করালী?

সেই যে বুড়ো লোকটা যার মাথার চুল থেকে গোঁফ-দাড়ি পর্যন্ত সাদা সে-ই কি? না ওই শক্ত-সমর্থ বেঁটেখাটো মানুষটা সে? কিংবা সেই অস্বাভাবিক লম্বা লোকটা—

না, কেউই জানে না কোন্ জন করালী। কোথায় বা তার বাড়ি? কে আছে তার? কেনই বা সে ডাকাত হয়েছে?

পুলিসের লোকরা পর্যন্ত জানত না এসব প্রশ্নের উত্তর, তারাও হন্যে হয়ে ঘুরেছিল করালীর সন্ধানে। করালীকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও সন্ধান পাওয়া যায় নি তার।

যখন করালীর ভয়ে দিশেহারা জমিদার-জোতদার মহাজনেরা, যখন মায়েরা দুরন্ত শিশুদের ভয় দেখায় করালী ডাকাতের নাম করে ঠিক তখনই একদিন 'ধরা পড়েছে' বললে ঠিক বলা হবে না; কারণ নিজে থেকে থানায় গিয়ে ধরা দিয়েছিল করালী ডাকাত।

কিন্তু কেন ধরা দিয়েছিল করালী? ধরা না দিয়ে কি তার উপায় ছিল না? না, ধরা দেওয়ার পেছনে অন্য কোন কারণ ছিল?

করালীর সব কথা জানতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে ছোট্ট গ্রাম মণিচকের পুবপাড়ার মাঠের ধারের শেষ বাড়িটায়।

বাড়ি বলতে একটা খড়ের ঘর। আর দুটো বলদ, একটা গাই গরু থাকার চালা।

বাড়িটাতে মানুষ বলতে তিনজন। দয়াল, দয়ালের মা কুসুম আর দয়ালের বাপ রামকেষ্ট।

নিজের সামান্য দু'বিঘে জমি রামকেষ্টর। নিজেই চাষ করত সে। এ ছাড়া জনমজুরের কাজও করত।

রামকেষ্ট দাসের সুনাম ছিল সাদাসিধেমানুষ বলে, সাতচড়ে রা কাটত না সে। কথা বলত খুব আস্তে। যে যা বলত তা-ই মেনে নিত। এ সবের জন্য রামকেষ্টকে বোকা বলত অনেকেই। ওর চোখের দিকে তাকালে হয়তো তেমনি মনে হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।



আমি করালী বলছি—সা—ব—ধা—ন। (পৃঃ তেরো)

কিন্তু এসবই ছিল ভুল চিন্তা।

অন্ধকার রাত্রে মাথায় ফেট্টি বেঁধে সারা মুখে চুন কালি মেখে কপালে লম্বা সিঁদুরের টিপ এঁকে হাতে তলোয়ার কিংবা বল্লম নিয়ে যখন গুরুগম্ভীর গলায় মুখের সামনে হাতের চেটো নাড়িয়ে হো-ও—ও—ও—শব্দ তুলত করালী তখন কেউ ভাবতেই পারত না ওই মানুষটিই মণিচকের সেই রামকেষ্ট দাস।

সেই মুহূর্তে ওর চোখের দিকে তাকালে হিম হয়ে আসত বুকের রক্ত। মনে হতো যেন অন্ধকারে হায়নার চোখের মতো জ্বলছে চোখদুটো। যে কোন সময় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে শিকারীর ওপর। ছিঁড়ে-খুঁড়ে শেষ করে ফেলতে পারে শিকারকে।

রামকেষ্ট যে ডাকাতের দল গড়বে কোনদিন নিজেও ভাবতে পারে নি সে। তবু সে ডাকাতের দল গড়েছিল এবং নিজেই সেই দলের সর্দার হয়েছিল। আর তার এই দল গড়ার কারণ ছিল কতকগুলো অমানুষিক ঘটনা। সেই ঘটনাগুলোর মধ্যে জমিদারের অত্যাচার এবং সুদখোরদের শঠতাই ছিল প্রধান।

গাঁয়ের জমিদার কিংশুক চৌধুরীর অত্যাচারের শিকার হয়েছিল রামকেষ্টদের বাড়ির লোকজন।

খাজনা দিতে না পারায় ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়েও জমিদারের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায় নি রামকেষ্টর বাপ। জমিদারের কতকগুলো অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল বলে তার ওপর এমন অত্যাচার হয়েছিল যে মরেই গিয়েছিল সে। আর সেই শোক সামলাতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল রামকেষ্টর মা।

এমনি করেই বাপ-মা হারিয়েছিল রামকেষ্ট। এই ঘটনার কিছুদিন পরই ডাকাত দল গড়েছিল সে। তবে অনেকদিন একথা জানতে পারে নি তার বৌ কুসুম। জেনেছিল বেশ কিছু পরে। তবে রামকেষ্ট তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যাতে পাঁচকান না হয়। এমন কি ছেলেও যেন না জানতে পারে।

যাতে কেউ সন্দেহ না করে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বরাবরের মতোই দিন কাটাত রামকেষ্ট। শুধু করার মধ্যে দু বিঘে জমি আর লাঙ্গল গরু কিনেছিল এই যা। অবশ্য আর একটা বড় কাজ করেছিল সে; সেটা হচ্ছে গাঁয়ের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল ছেলেকে। মনে মনে ঠিক করেছিল ছেলেকে কিছুতেই তার মতো 'মুখ্যু' করে রাখবে না। মানুষের মতো মানুষ করবে। ছেলে-দয়াল লেখাপড়ায় ছিল খুব ভাল। বৃত্তি পরীক্ষায় জল-পানি পেয়েছিল সে। রামকেষ্টর ইচ্ছে ছিল দয়াল আর একটু বড় হলে পাস করলে সে সব কিছু বলবে তাকে। বলবে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে টাকা পয়সা; আর কি করেই বা রোজগার করেছে টাকা-গুলো। কেনই বা ডাকাতি করেছে সে বলবে, তার রাগ ওই জমিদার সুদখোর মহাজনদের ওপর। ওদের ধনসম্পত্তি লুঠ করে, মারধোর করে বদলা নিয়েছে সে। মনের জ্বালা কমিয়েছে…।

কিন্তু সে সব কথা আর নিজমুখে বলা হয় নি রামকেষ্টর।

একদিন খেতে বসে বৌকে আগেরবারের ডাকাতির গল্প শোনাচ্ছিল সে। বলছিল…লোকটা যদি বাধা না দিত তাহলে কিছুই হতো না। হঠাৎ রামদা নিয়ে তেড়ে এসেছিল। সেষ পর্যন্ত প্রাণবাঁচাতেই তরোয়ালের কোপ লাগাতে হয়েছিল।

কুসুম জিজ্ঞেস করেছিল, 'লোকটা কি মরে গেছে?'

—ঠিক বুঝতে পারি নি। অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল।

—তাহলে আর বেঁচে নেই। ই-স্ স—একেবারে মেরে না ফেললেই পারতে—বলেছিল কুসুম।

রামকেষ্ট একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'ইচ্ছে করে তো মারি নি। বাধ্য হয়ে মেরেছি। সেই যে সেবার জয়ন্তপুরের নায়েবকে মারতে হল সেবারও ইচ্ছে করে মারি নি। লোকটা আমাকে চিনে ফেলেছিল তাই না মেরে উপায় ছিল না!

কে-কে ওখানে?

কথা বলতে বলতে দরজার দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিল রামকেষ্ট। ভাতের থালা ফেলে এক লাফে এসেছিল বারান্দায়। দেখেছিল দরজার মুখে বই খাতা ফেলে ছুটে পালাচ্ছে দয়াল। ও যে কখন স্কুল থেকে ফিরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল খেয়াল করে নি রামকেষ্ট বা কুসুম কেউই।

দয়াল সেই যে ছুটে পালিয়েছিল সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়ে গিয়েছিল তবু বাড়ি ফেরে নি সে। কিন্তু সন্ধ্যের পর কখনো বাড়ির বাইরে থাকে না দয়াল।

ভয় পেয়েছিল কুসুম। ভয় পেয়েছিল রামকেষ্টও। খুঁজতে বেরিয়েছিল দুজনেই! দয়ালের বন্ধুদের বাড়ি, মজাপুকুর ঘাট, রায়দীঘির পাড়, বারোয়ারীতলা …না, কোথাও দয়ালকে খুঁজে পায় নি তারা।

বাড়ি ফিরে কাঁদতে বসেছিল কুসুম।

এর পর রামকেষ্ট একাই খুঁজতে বেরিয়েছিল শ্মশানধারে সাধুবাবার কাছে।

ওকে দেখে রহস্যময় হাসি হেসেছিলেন সাধুবাবা। বলেছিলেন, 'কিরে, ছেলের খোঁজে এসেছিস তো?

—আজ্ঞে সাধুবাবা। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিল রামকেষ্ট।

—আছে, আছে। এখানেই আছে। ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে ঘুমোচ্ছে। তা হ্যাঁরে, ছেলেটা বাড়ি যেতে চাইছে না কেন? পিটেছিস না কি?

নাক কান মুলে জিব কেটেছিল রামকেষ্ট। বলেছিল, না বাবা, আমি জন্মে ছেলের গায়ে হাত তুলি নি।'

—তোর বৌ ?

—সেও না।

— তাহলে বাড়ি যেতে চাইছে না কেন ?

—কি জানি। তা দয়াল কোথায় সাধুবাবা ?

— বটগাছতলায় ঘুমোচ্ছে দ্যাখ গে !

বটগাছতলায় ছুটেছিল রামকেষ্ট।

কিন্তু বটগাছতলায় খুঁজে পাওয়া যায়নি দয়ালকে, কারণ বাবার গলা পেয়ে সেখান থেকে পালিয়েছিল দয়াল।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে শেষে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছিল রামকেষ্ট।

রামকেষ্ট বা কুসুম কেউই ভেবে পায় নি কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছিল দয়াল। সারা রাত চোখের পাতা এক করতে পারে নি ওরা।

পরদিন সকালে ঘরের দরজা খুলতেই রামকেষ্ট দেখেছিল দাওয়ায় শুয়ে রয়েছে দয়াল।

দরজা খোলার শব্দ পেয়েই বুঝি উঠে বসেছিল সে, পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পা বাড়ানোর আগেই হাতটা ধরে ফেলেছিল রামকেষ্ট।

রামকেষ্ট বলেছিল, কিরে, তুই পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন ? কি হয়েছে তোর ?

রামকেষ্টর প্রশ্নের উত্তর দেয় নি দয়াল। হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু পারে নি।

কুসুম বলেছিল, তুমি ওকে ছেড়ে দাও। আমি জিজ্ঞেস করছি।

রামকেষ্ট লাঙ্গল-গরু নিয়ে বেরিয়ে গেলে দয়ালকে ডেকে কাছে বসিয়েছিল কুসুম।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর যা বলেছিল দয়াল, তা শুনে চমকে উঠেছিল কুসুম। ভয় পেয়েছিল।

হ্যাঁ, আগের দিন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাপ-মায়ের সব কথাই শুনেছিল দয়াল। আর সে সব শুনেই ওর বাপের ওপর রাগ হয়েছিল ওর। মনের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল। ও ভাবতেই পারছিল না ওর বাপ খুনী ডাকাত। ও কিছুতেই ডাকাত বাপের কাছে থাকবে না। কিছুতেই না।

দয়ালের মুখ চেপে ধরে ওকে থামিয়েছিল কুসুম। আর রামকেষ্ট ফিরতে সব কথা বলেছিল তাকে।

রামকেষ্ট প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ছেলের ওপর। বলেছিল তুই আমাকে ঘেন্না করিস ? এত বড় কথা ?

কোন কথা বলে নি দয়াল। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার অতি পরিচিত মানুষটির দিকে। ওর মনে হয়েছিল এ তার বাপ নয়। অন্য মানুষ। যার পরিচয় খুনী বলে, ডাকাত বলে।

কুসুম বলেছিল, ওকে ছেড়ে দাও। ও ছেলেমানুষ—

—ও ছেলেমানুষ। তুই ? তুই কি আমাকে ঘেন্না করিস না ? কুসুমকে প্রশ্ন করেছিল রামকেষ্ট।

—আমি কি কোনদিন তেমন কিছু বলেছি তোমায় ?

—মুখের কথা নয়। মনের কথা বল্। তোকে বলতেই হবে।

কুসুমের কাঁধ দুটো ধরে এমনভাবে ঝাঁকিয়ে ছিল রামকেষ্ট, যে হাড়গোড় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছিল কুসুমের।

কুসুম বলেছিল, মেয়েরা কখনো স্বামীর কাজের বিচার করে ?

—ওসব ছেলেভুলোনো কথা শুনতে চাই না। সত্যি কথা শুনতে চাই।

গলায় অসম্ভব জোর দিয়েছিল রামকেষ্ট।

এবার আর কোন কথা বলে নি কুসুম। কলসীটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল জল আনতে।

আর রামকেষ্ট তার গমনপথের দিকে চেয়ে কী যেন বলেছিল বিড়বিড় করে এবং তার পরই ছুটেছিল থানায়।

থানার বড় সাহেবের কাছে যখন নিজেকে করালী ডাকাত বলে পরিচয় দিয়েছিল সে, তখন চমকে উঠেছিলেন সাহেব। সভয়ে কোমর থেকে রিভলবারটা টেনে নিয়েছিলেন তিনি।

তারপর—

তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত।

আদালতে দাঁড়িয়ে তার জীবনের ইতিহাস বলেছিল রামকেষ্ট। স্বীকার করেছিল সব কিছু এবং এর দুদিন পর জেলের মধ্যেই আত্মহত্যা করেছিল সে।



বৈশাখ মাস। কাঠফাটা রোদের ঝাঁজে গাঁয়ের খেতখামার, পথঘাট ফেটে চৌচির। খানাডোবাও গেছে শুকিয়ে। আগুন হাওয়ায় গাছপালা ধুঁকছে। মানুষজনও গরমে আইঢাই করছে। খুবই অসহনীয় অবস্থা।

একদিন পড়ন্ত বিকেলে ছেঁড়া ছেঁড়া কালোমেঘ সারা আকাশ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বর্ষণ শুরু হয় না। শুধু শব্দ করে বাতাস বইতে থাকে। ধুলোটে গরম হাওয়া।

কালবৈশাখীর লক্ষণ দেখে খেলা ছেড়ে মাঠ থেকে বাড়ির দিকে তাড়াতাড়ি পা চালায় ভোলানাথ। হাতে হকিস্টিক। ওর বন্ধু তরুণও আর অপেক্ষা করে না। দুজনেই লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে থাকে। চলার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর করে। অনেকটা পথ যেতে হবে। আসন্ন ঝড়বৃষ্টির আগে বাড়ি পৌঁছুতে হবে। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া বইতে আরম্ভ করে। শোঁ শোঁ শব্দ তুলে। ধুলোয় চার দিক আচ্ছন্ন। কাজেই সড়ক দিয়ে না গিয়ে ওরা শ্মশানের লাগোয়া কাঁচা পথ দিয়েই ছুটতে থাকে। একেবারে পড়িমরি করে। এদিক দিয়ে গেলে পথ অনেকটা কম। চট করে ফেরা যায়। ছুটতে ছুটতে ওরা হাঁপিয়ে যায়। ঘেমে যায় তবুও থামে না। কিন্তু যেই না শ্মশানের সামনে এসেছে তখনি শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। বড়ো বড়ো ফোঁটা তীরের মতো গায়ে এসে বিঁধতে থাকে অবিরাম। নাঃ, এতো ঝড়জলে আর যাওয়া সম্ভব নয়। এই শ্মশানেই দাঁড়াতে হয়।

গ্রামের শেষ প্রান্তে শ্মশান। ধারে কাছে কোন জনবসতি নেই। শুধু খেত আর খেত কিছু খানা-ডোবাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাই জায়গাটা নিরিবিলি। নিঝুম।

শ্মশানের চারদিক বড়ো বড়ো গাছগাছালি আর ঝোপঝাড়ে ঘেরা। মাঝখানে একটা পুরনো মন্দির। প্রবাদ আছে, রামলাল ডাকাত এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। খুবই ধুমধাম করেই প্রথম বছর কালী পুজো করেছিলেন। মায়ের সামনে দিয়েছিলেন একশ' একটা নরবলি। সেই সঙ্গে চলেছিল কীর্তন আর নাম গান। শুধু আশপাশের গাঁ নয়, দূরদূরান্ত থেকে লোক ঝেঁটিয়ে এসেছিল দেখতে, শুনতে।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। ডাকাতেরাও আর নেই। পুজোপাটও উঠে গেছে। বন্ধ হয়েছে নাম গান। মন্দিরের বাইরেটা শ্যাওলা পড়ে কালো হয়ে গেছে। ছাদেও ফাটল ধরেছে। ভেতরের আস্তরণ খসে গেছে। প্রতিমা ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। শুধু কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে দেউলটা।

এই শ্মশান সম্বন্ধে নানা রকম ভয়-ডর ছড়িয়ে

পড়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। গ্রামবাসীদের ধারণা মানুষ মরে ভূত হয় সেই ভূত থাকে বনবাদাড়ে, আর নিরিবিলি শ্মশানে মশানের বড়ো গাছগাছালিতে। পারতপক্ষে তারা লোকালয়ের আনাচে-কানাচে ঘেঁষে না। কারণ বেঁচে থাকার সময় সংসারের ঝঞ্ঝাটে তিতি বিরক্ত হয়েছে, ঘেন্না ধরে গেছে মনুষ্যজীবনে। কাজেই ভূত হওয়ার পর একটু নিরিবিলি আশ্রয় চায়। নির্ঝঞ্ঝাট ভাবে জীবন কাটাতে ভালবাসে। লোকজনের আনাগোনা আর পছন্দ করে না। এলে রেগে যায়। অনেক সময় ক্ষেপে গিয়ে ভয় দেখায়, ক্ষতিও করে। তাই সাধারণ মানুষ বড় একটা এদিকে আসে না। এমন কোন ডাকাবুকো লোকও রাত বিরেতে এপথ মাড়ায় না। শবদাহ সাধারণতঃ দিনমানেই সারে গাঁয়ের লোক।

দুজনেই মুখ তুলে শ্মশানের দিকে চায়। সন্ধের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। সেই অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় গাছ-গাছালি। দেখে ওদের গা ছমছম করে। তবুও বাধ্য হয়ে আশ্রয়ের জন্যে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

ঢোকবার চওড়া পথটা এবড়োখেবড়ো। দুধারে গজিয়ে উঠেছে বনতুলসী আর আকন্দের ঝোপ। ঝোপের ভেতর থেকে ভেসে আসে ব্যাঙের ডাক আর ঝিঁ ঝিঁ করে একটানা গান। থেকে থেকে জ্বলে উঠছে জোনাকি। ঘন আঁধারে জোনাকির মিটমিটে আলো পরিবেশটাকে করেছে আরও ভয়াল। দুজনে পাশাপাশি ভেতরে ঢুকে একটা বড়ো গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। ঝড়ের ঝাপটায় ঝাঁকড়া মাথাটা শব্দ করে নড়ছে। ডালপালায় আশ্রিত পাখিরা ভয়ে ক্যাচর-ম্যাচর করছে। হঠাৎ পিলে চমকানো একটা বাজ পড়ে।

চমকে ওঠে দুজনেই। চোখে পলক ফেলে ভাবে এ ভাবে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা আর উচিত নয়! নিরাপদও নয়। কারণ একে জল পড়ছে, তার ওপর যে কোন সময় ডাল টাল ভেঙে মাথায় পড়তে পারে। তাহলে আর রক্ষে নেই। কিন্তু কি করা যায় এখন? ভেবে কোনো কুল পায় না ওরা। গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে করে দাঁড়িয়ে দুজনে দুজনের মুখের দিকে চায়।

এক সময় তরুণ জিজ্ঞেস করে, এখনে দাঁড়িয়ে থাকাটা কি ঠিক হচ্ছে?



…সামনেই সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা মড়া (পৃঃ কুড়ি)

আমতা আমতা করে ভোলানাথ বলে, তাই তো? তাড়া দেয় তরুণ কি করবি চটপট্ বল?

—সেটাই ভাবছি।

—ভাবাভাবি ছেড়ে দিয়ে চ মন্দিরে যাই।

—আঃ। আঁতকে ওঠে ভোলানাথ।

—ভয় পেলি?

আমি বামুনের ছেলে, ভয়ডর আমার নেই।

—তোর পৈতেই হয় নি এখনও, বামুন হলি কি করে?

শুনে বেশ হকচকিয়ে যায় ভোলানাথ। কিন্তু দমে না। বড়াই করে বলে, আরে কেউটে বাচ্চা হলেও কেউটে। তাই আমার পৈতে হোক বা না হোক বামুনের বংশে জন্ম তো।

তরুণের আর তর সইছিল না! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কাঁহাতক ভেজা যায়। তারপর মাথায় যদি ডাল ভেঙে পড়ে তবে আর দেখতে হবে না। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও এগোতে সাহস হয় না। ভয় পায়। যদি কিছু হয়, তখন কি হবে? দরকার কি এমন ঝক্কি ঝামেলায়। একটা ঢোক গিলে বলে, তুই ফরওয়ার্ডে খেলিস', তুই আগে যা। আমি গোলে খেলি, পেছনে আছি।

ভোলানাথ ভয়ে শিউরে ওঠে। তবুও চুপ করে থাকে। বন্ধুর কাছে সাহসের পরীক্ষায় হার স্বীকার করা বড়ো লজ্জার ব্যাপার, দারুণ আত্মসম্মানে লাগে। আর কোন কিশোরই চায় না তাকে কেউ ভীরু ভাবুক। চোখে পলক ফেলে ভাবে ঠিক আছে! আগেই যাবে। তবে এগোবার আগে একবার চোখ বুজে ব্যায়ামের আখড়ার হনুমানজির মূর্তিটা স্মরণ করে। শুনেছে মন দিয়ে ডাকলে ভয়ডর দূর হয়, আপদবিপদও কেটে যায়!

ধীর পায়ে মন্দিরের দিকে এগোতে থাকে ভোলানাথ। ঠিক পেছনেই তরুণ। পথ পিচ্ছিল। দুজনেই সাবধানে পা ফেলে। কয়েক পা যাবার পর হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের ধাক্কায় পা পিছলে পড়ে যায় ভোলানাথ। কিন্তু চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে যায়। আরে একবার কেঁদেই কারা যেন থেমে গেল! আশ্চর্য ব্যাপার তো? কিন্তু কাঁদলো কারা? এতক্ষণ তো কোনো কান্নার আওয়াজ শোনে নি? তবে? মুখ ঘুরিয়ে চারদিকে ভাল করে দেখে। আশপাশে কোনো লোকজন চোখে পড়ে না।

ঝড়ো হাওয়া বইছে, তবে দমকা নয়। কিন্তু বৃষ্টি এক নাগাড়ে পড়ছে। থামার একটুও লক্ষণ নেই। ভোলানাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ভয় পেলেও মনে একটা খটকা লাগে। এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কারা বসে কাঁদতে পারে। মানুষজন তো নিশ্চয়ই নয়। কারণ দুঃখ কষ্ট হলে তো একবার কেঁদেই কেউ আর থেমে থাকে না। তবে? একটা কিন্তুময় দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়।

আবার দমকা বাতাস আসে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় কান্নার ঐকতান। ঠিক আগের মতো সুর করে। মনে হয় কয়েক হাতের মধ্যেই কারা যেন কাঁদছে। তরুণ ভয়ে ভোলানাথের গেঞ্জিটা শক্ত করে চেপে ধরে। ভোলানাথও আতঙ্কে হিতাহিত জ্ঞান হারায়। বেপরোয়া হয়ে অন্ধকারে এলোমেলো স্টিক চালাতে থাকে। পথের পাশে বাঁশের পুরনো বেড়াটা ভেঙে চুরমার। তবুও স্টিক থামায় না। মেরেই চলে।

তরুণের ধাক্কায় ভোলানাথের হুঁশ হয়। স্টিক থামিয়ে হাঁপাতে থাকে। তবে আতঙ্কের ভাব তখনও কাটে নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কান্নার সুর আর শুনতে পায় না। একদম থেমে গেছে।

বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়। তবুও এগোতে সাহস পায় না। কি জানি আবার যদি কান্না শুরু হয়। অজানা আতঙ্কে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

আবার দমকা বাতাস আসে। কিন্তু এবার আর আগের মতো কান্নার ঐকতান হয় না। শুধু একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ হয়। ওরা এক পা এগিয়ে গিয়ে দেখে বাঁশের বেড়াটা ভেঙে চুরমার। শুধু একটা বাঁশ দাঁড়িয়ে আছে। ডগাটা কাটা। দমকা বাতাস কাটা ডগার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় কান্নার সুর তুলে যাচ্ছে। বুঝতে পারে কান্নার কারণটা। হেসে ফেলে ওরা।

মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায় ওরা। সামনে গিয়ে দেখে দরজার একটা পাল্লা একটু খোলা। স্টিক দিয়ে জোরে ধাক্কা দিতেই পাল্লা দুটো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে যায়। একটা চামসে গন্ধ নাকে এসে লাগে। ভেতরটা ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। মানুষের সাড়া পেয়ে কয়েকটা চামচিকে উড়ে এসে দুজনের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভোলানাথ চমকে গেলেও ঘাবড়ায় না। ঘাড় ঘুরিয়ে তরুণকে সাহস দেয়, ভয় পাসনি, চামচিকে ছিল।

তরুণের পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ। কথা বলার শক্তি ওর নেই। শুধু অসহায় ভাবে চেয়ে থাকে।

ভেতরে ঢুকে ঘরের চারদিকে চায় ভোলানাথ। অন্ধকারে এতক্ষণ থাকায় ওর চোখটা অন্ধকারে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মনে হয় ঘরের মাঝখানে একটা সাদা চাদর পাতা রয়েছে। আর কয়েকটা জীবন্তপ্রাণী নড়াচড়া করছে। জ্বল জ্বল করছে ওদের চোখ। আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে ভোলানাথ। কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোয় না। দেহটা কাঁপতে থাকে। মাথার মধ্যেও ঝিম ঝিম শুরু হয়। কি যে করবে বুঝতে পারে না। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ হাত থেকে হকি স্টিকটা পড়ে যায়।

স্টিকের আচমকা শব্দে চলমান প্রাণীরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভেতরে আর থাকে না। ওদের পা ছুঁয়ে

ছুটে বেরিয়ে যায়। বাইরে গিয়ে গলা ফাটিয়ে হুক্কা হুয়া শব্দ করে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ভোলানাথ চেতনা হারায় না। তবে আচ্ছন্ন হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। একটুও নড়তে পারে না। নড়াচড়ার মতো অবস্থা তখন নয়। একেবারে নিশ্চল।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। আলোর ঝলকানিতে দেখতে পায় সামনেই সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে একটা মড়া। শুধু মুখের কিছুটা অংশ খোলা।

একে ঘুট ঘুটে অন্ধকার, তার ওপর সামনে পড়ে আছে একটা মড়া। ভাবাই যায় না। দুজনেরই মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। হাতপা পেটের মধ্যে যেন সেঁধিয়ে যেতে চায়! সারা শরীর হিম। নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হয়। উঃ কি দারুণ ভয়াবহ অবস্থা! চোখ খুলে আর তাকাতে সাহস পায় না।

সময় কেটে যায়। মশার গুনগুনানিতে ঘরটা মুখর। ওরা দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। নীরবে। কিছুই ভাবতে পারে না। ভাববার মতো অবস্থা দুজনের কারুর তখন নয়।

এক সময় লোকজনের অনুচ্চ কলরব কানে যায়। কিন্তু চোখ খুলতে সাহস পায় না। কি জানি হয়তো ভুল শুনছে? আবার মনে হয় মড়াটা কি কথা বলছে? ভয় ও সংশয় মনের মধ্যে দুলতে থাকে।

লোকজনের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। কথা যেন আরও কাছে মনে হয়। তখন কোনো রকমে ওরা চোখ খুলে চায়। হ্যাঁ, জন কয়েক লোক আলো হাতে সত্যিই এগিয়ে আসছে। মিথ্যে নয়। দুজনেই পাল্লায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অসহায় চোখে।

কথা বলতে বলতে লোকজন মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ওদের দেখেই চমকে ওঠে সকলে। ঠিক দেখছে তো? না চোখের ভুল? মনের মধ্যে একটা খটকা লাগে। কোনো কথা বলতে পারে না। শুধু অবাক হয়ে চেয়েই আছে। বিশ্বাস করতে পারে না নিজেদের লোক। জিজ্ঞেস করে, তোমরা এখানে কেন?

তরুণের ভয় কাটলেও গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই থাকে।

লোকজন দেখে ভোলানাথের আচ্ছন্নের ভাব দূর হয়। কিন্তু মন এলোমেলো, বিভ্রান্ত। একটা ঢোক গিলে কোনো রকমে বলে, আপনারা কোত্থেকে?

—মড়া রেখে গ্রাম থেকে কাঠ আনতে গিয়েছিলাম

ভোলানাথ নিজেকে সামলে নিয়ে পিট পিট করে সকলের দিকে চায়। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে ঠিক হয়ে দাঁড়ায়। মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, আশ্চর্য লোক তো আপনারা।

শুনে সবাই কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। বলে কি ছেলেটা? বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে বয়স্ক লোকটি জিজ্ঞেস করে, কেন, কেন?

—আমরা না এলে তো মড়া শেয়ালে খেয়ে ফেলতো।

বলে কি ফচকে ছোঁড়া? সত্যি? না ঠাট্টা করছে? তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে হুড়মুড় করে সকলেই মড়ার সামনে যায়। তাই তো? ঠিকই বলেছে। কামড়ে মুখের কিছু অংশ যে ছিঁড়ে ফেলেছে। বড়ো বিভৎস দৃশ্য। চেয়ে দেখা যায় না। শিউরে ওঠে সবাই। কোনো কথা না বলে নিজেদের মধ্যেই শুধু মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। তারপর চোখ তুলে ছেলে দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে। চাউনিতে বিস্ময়।

ওরা আর কথা বাড়ায় না। দাঁড়িয়েও থাকে না। কারণ কৌতূহলী হয়ে লোকেরা পাছে কিছু জিজ্ঞেস করে? যদি আরও কিছু জানতে চায়? তা হলে তো কোনো উত্তর দিতে পারবে না। তখন অনেক ফেচাং হবে। কি দরকার এসব ঝুট ঝামেলার। তাই পড়ে থাকা স্টিকটা চট্ করে হাতে তুলে নেয় ভোলানাথ। সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে একটু মুচকি হাসল। তারপর তরুণকে সঙ্গে নিয়ে দুলকি চালে শ্মশান থেকে বেরিয়ে আসে।

ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে শব্দ করে তখনও বাতাস বইছে। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। ভিজে মাটি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছে। কাঁচা পথ পার হয়ে সড়কে এসে ওঠে ওরা। নির্জন পথ। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ব্যাঙ চেল্লাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক। পাশাপাশি চলছে দুজনে। চুপচাপ। এক সময় ভোলানাথ মুখ ঘুরিয়ে তরুণের দিকে চায়। খুশি খুশি মুখে বলে। দেখলি তো পৈতে ছাড়া বামুনের কেমন হিম্মত।

বলেই শব্দ করে হেসে ওঠে ভোলানাথ। শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়।

খেলাধুলার আসর

শিবাজী ব্যানার্জীর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা

পার্থপ্রতিম সিংহ

মোহনবাগান ক্লাবের গোলরক্ষক শিবাজী ব্যানার্জী। কি ভাবছো জানি—ভাবছো এই কথাটা বলার কোনও দরকার ছিল কি ?" আচ্ছা পরের কথাটা শোনো—তিনি দারুণ উঁচু খেলোয়াড়। হ্যাঁ, দুরকম অর্থেই তিনি উঁচু! এমনিতেই তিনকাঠির তলায় দাঁড়ালে তার মাথা ছুঁই ছুঁই করে তৃতীয় কাঠিটাকে আর খেলার সময় তার প্রতিচ্ছবি যেন আরও খানিকটা লম্বা হয়ে ওঠে। সেই দীর্ঘদেহী গোলরক্ষক শিবাজী ব্যানার্জীর জীবনের মনে রাখার মত কয়েকটা অধ্যায় তোমাদের সামনে হাজির হচ্ছে—কি ? এবার তো একটু নড়েচড়ে বসতেই হয়।

শিবাজী ব্যানার্জী, মানে যিনি গোলটোল রুখে দেন আর কি, তাঁর জীবনের যা কিছু মনে রাখার মত তা সবই এমন একজন মানুষকে ঘিরে যিনি ওই গোল-টোল করতেই ওস্তাদ। সেই মানুষটি কে বলতো ? বাঃ, ঠিক ধরেছো তো—মানুষটি হ'লেন বলের রাজা (গোলের রাজাও বলতে পারো) পেলে। সেই মনে রাখার মত ঘটনাগুলোই শিবাজীর নিজের ভাষায় শোনো।

স্মরণীয় ম্যাচ ?—আমার ফুটবল জীবন আর কতটুকু ? পনেরো বছর ধরে কলকাতা ময়দান দাপিয়ে যিনি খেলে বেড়াচ্ছেন সেই হাবিবদাও যখন বলেছেন যে তাঁর ফুটবল জীবনের স্মরণীয় খেলা মোহনবাগান কসমস প্রদর্শনী খেলা (যেটাকে চলতি কথায় 'পেলে ম্যাচ' বলে আরকি) তখন আমার জীবনের মনে রাখার মত ম্যাচ আর কোনটা হতে পারে। হ্যাঁ ওই ম্যাচটার গোড়াতেই একটা গোল খেয়ে বেশ দমে গিয়েছিলাম। তারপর কি ইচ্ছে হচ্ছিল জানো ? ইচ্ছে হচ্ছিল কসমস একটা ফ্রিকিক পাক আর পেলে সেটা মারুক। এর আগে দেশী-বিদেশী অনেক পত্রিকায় পেলের অলৌকিক ফ্রিকিকের কথা শুনেছিলাম ; তাই স্বচক্ষে একটা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। অবশেষে সত্যি সত্যি কসমস ক্লাব ফ্রিকিক পেল আর সেটা মারতে এলেন স্বয়ং পেলে। আমি তখন টেনশনের চূড়ান্ত পর্যায়ে। আর কি আশ্চর্য ইডেনের দর্শকেরাও চিৎকার করে



শিবাজী ব্যানার্জী

উঠল "গোল! গোল!" বলে। অবশেষে দারুণ একটা বাঁক খাওয়ানো ফ্রিকিক যখন আটকে দিলাম আর গ্যালারী থেকে উঠে আসা একটা গর্জনের ঢেউ আমাকে

কাঁপিয়ে দিয়ে বয়ে গেল তখন আমি সত্যিই বুঝতে পারছিলাম না আমি কি করেছি।

স্মরণীয় মুহূর্ত?—গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক আলো ঝলমল সন্ধ্যায় মুখোমুখি হয়েছিলাম পেলের (যদিও কিঙিং ম্যানেজ করে)। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ সামনা-সামনি কথাও বলেছিলাম! মাত্র চার মিনিট, তবুও জীবনকালের অসংখ্য মুহূর্তের মধ্যে চার মিনিটের এই সাক্ষাৎকারটি আমার মনের মনিকোঠায় পলকাটা হীরের মত জ্বলজ্বল করছে। ফুটবলের কিংবদন্তীকে কয়েক ফুটের মধ্যে পাওয়ার আনন্দ এই মুহূর্তটিকে আমার কাছে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

মনে রাখার মত মজার ঘটনা?—আপাততঃ যেটা মনে পড়েছে সেটারও নায়ক কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ যাদুকর, মানে বল পায়ে পেলে যিনি যাদু দেখান। তাঁর দল কসমসের সাথে আমাদের মোহনবাগানের প্রদর্শনী খেলার আগে আমরা দুটো দলই ক্লাব-হাউসের সাজঘরে ছিলাম। হঠাৎ মান্নাদা (শৈলেন মান্না) এসে বললেন "ওরা বলছে ওরা আমাদের সাথে একসাথে নামবে।" আমরা তখন তৈরী বেরোবার জন্য—সামনে বল হাতে আমি। হঠাৎ বেরিয়েই দেখি ওরা নামছে। তখন যে আগ্রহ নিয়ে লোকে ঠাকুর দেখে সেই আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়লাম পেলেকে দেখব বলে। দেখি কাঁধের ওপর দিয়ে বাবলু (সুব্রত ভট্টাচার্য) পাশ থেকে গৌতম প্রত্যেকেই সাগ্রহে তাকিয়ে আছে একই কারণে। কিন্তু কালো মানুষটি তখন দীর্ঘদেহী শ্বেতাঙ্গ চিন্যা-লিয়ার অন্তরালে। তাকে ভালোভাবে দেখার জন্য সে কি কৌতূহল আমাদের মধ্যে! দু'মিনিট বাদে যার সঙ্গে মাঠে দেখা হবে তাকে দেখার জন্য এরকম উদগ্র কৌতূহল—সত্যি, কিছুক্ষণ পরে দারুণ হাসি পেয়েছিল ব্যাপারটা ভেবে। [ফটো ঃ—নবারুণ ঘোষ]

মনজয়ী নাম মজিদ

দূর্বার গঙ্গোপাধ্যায়

মাঠের ভেতর যার মাপামাপা নিখুঁত পাস আর ধারাল সট প্রায়শই বিপক্ষকে ভীষণভাবে বিপদে ফেলছে, কলকাতায় এসেই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাওয়া সেই সুন্দর চেহারার অসাধারণ ইরানী ফুটবলার আবদুল মজিদ বাসকার (Bashker) মাঠের বাইরেও কথাবার্তা বলেন খুব মেপেমেপে, কিছুটা চিন্তা করে থেমে থেমে। এর কারণ একটা অবশ্যই আছে, ভুল বললাম এর কারণ দুটো। প্রথমতঃ সে কলকাতায় একেবারেই নূতন, অজানা—অচেনা পরিবেশ, দ্বিতীয়তঃ এটাই মুখ্য কারণ যে সে প্রায় বছর খানেক ধরে ভারতে কাটালেও ইংরাজী ভাষাটা তার মুখে ঠিকমত আসে না। কলকাতায় এসে তার প্রধান ভরসা পাশের ঘরের সহপাঠী আবের ইরানী খাবাজী।

লম্বা—চওড়া চেহারা, গায়ের রং ধবধবে ফর্সা এবং মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাটা। বয়স ওর নিজের মতে ২৪। ফুটবল মাঠে ও কেমন সে কথা বলার দরকার হবে না কারণ তোমাদের মধ্যে অনেকেই মাঠে ওর খেলা দেখে এবং শুনে মনে মনে একটা ছবি এঁকে নিয়েছ। তবে মাঠের বাইরে মজিদ অত্যন্ত ভদ্র বিনয়ী এবং লাজুক প্রকৃতির। ফেডারেশন কাপে ওর খেলা দেখে অনেকেই সঙ্কোচ দূরে সরিয়ে বলেছেন—"মজিদই ভারতের এক নম্বর স্ট্রাইকার'। তবে ও যেহেতু ভারতীয় দলের জার্সি কোনদিনই গায়ে তুলতে পারবেনা (কারণ সে অভারতীয়) এবং ওর ভারতে থাকার মেয়াদ যেহেতু মাত্র ৪ বছর তাই ভারতে থাকলে ও কি করতো সে আলোচনায় না গিয়ে মজিদের ফুটবল জীবনের কথা জানাই উচিৎ হবে না কি? অবশ্য তার আগে ওর ভারতে আসার

কারনটা মজিদতের মুখেই শুনে নাও—"আজ থেকে ১০ মাস আগে আমরা (জামসেদ নাথিরিকে সঙ্গী করে) যখন আকাশপথে ইরান থেকে এই ভারতে উড়ে এলাম তখন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই তা হল পড়াশুনোর সাগরে ডুব দেওয়া। বর্তমানে আমি বি-কম পড়ুয়া এবং এই পড়াশুনোর কারণেই আমি ভারতে এসেছিলাম ইরানে ভাল ইউনিভার্সিটির যথেষ্ট অভাব বলে। বম্বে থাকতে থাকতে জে, সি, টি, টাটা স্পোর্টস প্রভৃতি বিখ্যাত দলগুলো আমাকে নেবার জন্য আগ্রহ দেখালেও সাড়া দিই নি। এর মধ্যে একদিন আমাদের সহপাঠী খাবাজী জানান যে কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল আমাদের পেতে আগ্রহী। এর মধ্যে কলকাতায় ভারতের সবচেয়ে ভাল ফুটবল খেলা হয় শুনেছিলাম। তারপর দলের কর্মকর্তারা যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেন। তবে আমরা কলকাতায় খেলার সময়টুকুই শুধু থাকব, ফাঁক পেলেই ছুটে যেতে হবে আলিগড়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোতে মন দেবার জন্য।"

ইরানের তেলের খনি কুজিস্থানে খোরমনোয়ারে মজিদের জন্ম। চার ভাই চার বোনের (তিন জন বিবাহিত) পরিবারে মজিদের স্থান দ্বিতীয়। ফুটবলই মজিদের প্রথম ভালবাসা। বাড়ীর অন্যান্য ভাইরাও ফুটবল খেলতেন। ভারতে আসার আগে মজিদ খেলত শাহবজ ক্লাবে। এর আগে ওখানের দুই বিখ্যাত "ল্যাজ" ও "তাজ" ক্লাবেও মজিদ খেলেছে। ইরান বিশ্বকাপ ফুটবলে অন্যান্য এশিয়ান টুর্নামেন্টে খেললেও মজিদ কিন্তু ইরানের হয়ে কোন বড় প্রতিযোগিতায় খেলে নি। অথচ কলকাতায় আসার আগে একটা কথা ভীষণভাবে রটেছিল যে মজিদ বিশ্বকাপ খেলোয়াড়। মজিদকে কথাটা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন ও ভয়মাখানো দৃষ্টি নিয়ে বলেছিল—"কই নাতো।"

কিন্তু কলকাতাকে তার কেমন লাগছে ?—কথাটা জানতে চাইতেই বলেছিল—"কলকাতাকে শুধু শহর না বলে ফুটবল শহর বলাই ভাল। এখানে থাকতে মোটামুটি ভালই লাগছে। খাওয়া-দাওয়া অসুবিধা বিশেষ হচ্ছে না। তবে দুটো সমস্যা এখানে ভীষণ কষ্ট দেয়। প্রথম হল প্রচন্ড লোডশেডিং। আর হল রাস্তায় বেরোলে এতবেশী ট্র্যাফিক জ্যাম হয় যে অপেক্ষা করতেই অর্ধেকটা সময় কেটে যায়। এছাড়া গরমটাও নরম নয়। তবে এখানকার দর্শকদের চোখ থাকে শুধু গোলের দিকে—ভাল খেলার দিকে নয়। এখানকার দর্শকরা প্রচণ্ড ফুটবল পাগল।



মজিদ

কলকাতায় সদ্য হয়ে যাওয়া ফেডারেশন কাপে মহামেডান, মোহনবাগান দুদলের খেলাই মজিদ দেখেছে, তবে ওর মতে দুটোই "গুড টিম"।

ইরানের ফুটবলে এখন জোয়ার চলছে। এর কারণ হিসাবে মজিদ বলল—"ইরান এখন মডার্ন ফুটবলে অনেক এগিয়ে গেছে। ইরানের সাথে ইউরোপীয় ফুটবলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। ইরানের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিদেশী কোচ আনা হয়েছে। ওখানে এখন প্রধানতঃ ৪—৩—৩ প্রথায় খেলা। তবে ইরানী দর্শকরা শুধু গোল নয়, ভাল খেলা দেখার প্রত্যাশী। ভারত এখনো সেকেলে পদ্ধতিতে ফুটবল খেলছে। এখানে প্রচুর ভাল প্লেয়ার রয়েছে। তবে টিম-কম্বিনেশনটা এখানে কম।"

মজিদের ওজন এখন ৭০ কেজি। এই ওজনের মারাত্মক খেলোয়াড়টি খেলা শেষ হলেই ফুটবলের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে পড়াশুনোর বইতে মন দেয়। কলকাতা শহরটাকে পুরো ঘুরে দেখার ইচ্ছা আছে যা এখনো পূরণ হয়নি। তবে কলকাতায় ছোটদের খুব ভাল লেগেছে ওর। তবে আমি জানি ওর এই "ভাল লাগার" কথা তোমাদের ভাল লাগলেও তোমাদের সবচেয়ে ভাল লাগবে মজিদের পা থেকে চোখ ধাঁধানো ফুটবল দেখলে। কথাটা ভুল বললাম কি?

সেণ্ট মার্গারেট স্কুলের সেরা সাঁতারু লীনা মিত্র

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

উত্তর কলকাতার সেণ্ট মার্গারেট স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে লীনা মিত্র। ডাক নাম মেরী। এই নামে স্কুলে গিয়ে খোঁজ করলে যে কেউ দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে—সাঁতারু মেরি তো! হ্যাঁ, বলে এগিয়ে যেতেই খোঁজ পেয়ে গেলাম লীনার। বয়স



লীনা মিত্র

চৌদ্দ বছর, বেশ স্মার্ট। কথার উত্তর একটু তাড়াতাড়ি বলে কারণ হয়তো সাঁতার কেটে আগে পৌছানোর অভ্যাসে। সাঁতারে সে এখন স্কুলের সেরা। তবে কেয়া সেনও একই স্কুলের সঙ্গী। ও সাঁতারে পারদর্শী লীনা কিছুটা ভয়ে ভয়ে জেঠুর বনি মিত্রের হাত ধরে হেদুয়ার ন্যাশানল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনে সাঁতার শিখতে আসে ১৯৭৩ সালে বিখ্যাত সাঁতারু শম্ভু সাহা ও বিমল বর্মনের কাছে। সাঁতার রপ্ত করতে লীনাকে বেশী দিন সময় নিতে হয়নি। দু'বছরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তালিম দিয়ে লীনা সবার নজর কেড়ে নেয়। এবার পাশে এগিয়ে এলেন রেলওয়ের বিখ্যাত সাঁতারু সমর দাস। বিশেষ অনুশীলনের মধ্যে লীনা ভবিষ্যত পরিকল্পনার আলো দেখতে থাকে। ১৯৭৬ সালে পাতিয়ালায় প্রথম বয়স-ভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেও তেমন কোন উন্নত ফলাফল দেখাতে পারেনি। তাতে আরো জেদ চেপে যায় লীনার। তাকে কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে সাফল্যের সিঁড়িকে আঁকড়ে ধরতে হবে। অনুশীলনের পর অনুশীলন চলতে থাকল। সকালে-বিকেলে শুধু প্র্যাকটিশ আর প্র্যাকটিশ। ১৯৭৭ সালে ত্রিবান্দ্রামে বয়স ভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় লীনা দ্বিতীয় স্থান পেল। ১৯৭৮ সালে ন্যাশানল সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা হিসেবে আবার মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত বয়স ভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় ২টি বিষয়ে দ্বিতীয় এবং একটি বিষয়ে তৃতীয় হয়ে স্কুলের সেরা সাঁতারুর সম্মান পায়। ঐ বছরেই ভারতীয় স্কুল দলের প্রতিনিধি হিসেবে বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দেয়। ১৯৭৯ সালে ষষ্ঠ জাতীয় বয়স ভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় বোম্বাইতে তিনটি বিষয়ে দ্বিতীয় হয়ে অগ্রগতির ধাপে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে থাকে। ঐ বছরেই দিল্লীতে ডালমিয়া সন্তরণ প্রতিযোগিতায় দুটি বিষয়ে অংশ নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়ে আবার যোগ্যতার পরিচয় দেয় এবং পাশাপাশি সর্বভারতীয় স্কুল প্রতিযোগিতায়

সাঁতারের প্রতিনিধি হিসেবে তৃতীয় স্থান পায় লীনা মিত্র।

আচ্ছা লীনা, তোমার প্রিয় সাঁতারু কে? প্রিয় সাঁতারু বলতে কেউ নেই তবে ঝুনুদি অর্থাৎ ডাইভার চন্দনা সরকারের সাহসিকতাই আমাকে বড় করে তুলতে সাহায্য করছে।

পুরস্কার পেলে কাদের কথা তোমার বেশী মনে পড়ে? মা-বাবা, ঠাকুমা, জেঠু আর গনেন বিশ্বাস ও দিলীপ মিত্রের কথা।

কোথায় গিয়ে তুমি সবচেয়ে বেশী আনন্দে সাঁতার কেটেছো? সে আর বলতে মাদ্রাজে।

তুমি কি বাড়ী থেকে একা সাঁতার কাটো—না, না, আমার দাদা দীপ মিত্র (বাপি) দারুণ সাঁতার কাটে। ওকে দেখেই তো আমার জলে আসা।

এখন তুমি কার কাছে সাঁতার শিখছো? কাশীনাথ রায়ের কাছে। তোমার প্রিয় বন্ধু কে? শাকিলা (কৃষ্ণা) বিশ্বাস। সাঁতার বাদে আর কোন খেলা ভালবাসো? টেবল টেনিস। পড়ার বই-এর পাশে কোন বই পড়তে ভাল লাগে? খেলার বইগুলো টেবিলেই থাকে। আর সুযোগ পেলেই সন্ধ্যার সময় টি-ভি দেখি।

স্কুল থেকে কেমন সুযোগ সুবিধা পাও? স্কুলে কোন অসুবিধা হয় না। গেম টিচার স্নিগ্ধা বোস সব সময় আমাকে উৎসাহ দেন। তোমার ইছা কি? ইচ্ছা একটাই, ভারতের বড় সাঁতারু হবো।

সুপারষ্টার বথাম

—উমাশঙ্কর বসু

বর্তমান ক্রিকেটে যে খেলোয়াড়টি একইসাথে ব্যাটে, বলে, ফিল্ডিংয়ে সব্বাইকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে চলেছে তার নাম তোমাদের কাছে এখন নিশ্চয়ই আর অজানা নয়, সে হচ্ছে আয়ান টেরেন্স বথাম, এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার।

বথাম মাঠে থাকা মানেই বিপক্ষ দলের কাছে এক বিশ্রী ব্যাপার, হাতে যখন থাকে বল তখন ব্যাটধারীরা ওর স্যুইং কাটার ইত্যাদি বলগুলোকে সামাল দিতে এত ব্যস্ত থাকে যে নিজেদের রান করার কথাতো প্রায় একদম ভুলেই যায়। এর মধ্যেই যারা একটু বেশী বেসামাল হয়ে পড়ে তারা একেবারে সোজা আউট। আর ব্যাট হাতে বথাম! আরও নিষ্ঠুর। বল একটু উল্টোপাল্টা হলেই হল সোজা চার নয়ত ছক্কা তখন। বোলার বা ফিল্ডসম্যানদের ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। এতো গেল ব্যাটবলের কথা। বথামের হাতে ক্যাচ দিয়ে যে রক্ষা পাওয়া যায় না এ কথাটা আর কোনও ব্যাটসম্যানকে মনে করিয়ে দিতে হয় না। বথাম যদি কোন একটা ইনিংসে ব্যাটেবলে তোমাকে খুশী নাও করতে পারে তবে স্লিপে দাঁড়িয়ে লাফঝাঁপ দিয়ে এমন শক্ত শক্ত ক্যাচ ধরবে যে তুমি সেই ক্যাচ কখনও দেখ নি আর সেই লাফঝাঁপ—একমাত্র জেমিনি বা রেমন সার্কাসেই দেখেছ। উপরের কথাগুলো যে কতখানি সত্য তার প্রমাণতো আমরা পেয়েই গেছি বোম্বাইয়ে ওয়াংখেরে ষ্টেডিয়ামে। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের স্বর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ইংল্যান্ড সেখানে ভারতের সাথে 'জুবিলী টেস্ট' খেলতে এসেছিল। আমাদের তখন দেখেকে! সবেমাত্র অস্ট্রেলিয়া আর পাকিস্তানকে হারিয়ে রাবারগুলো ঘরে এনেছি। সুতরাং এবার ইংল্যান্ডকে হারানোর পালা, কিন্তু সব হিসেব গন্ডগোল করে দিল এই বথাম, একাই ব্যাট এবং বল করে ভারতীয় দলটাকে একেবারে যাকে বলে নাকাল করে দিয়ে ইংল্যান্ডকে জিতিয়ে দিল। তাইতো বথাম একাই একশো, এই টেস্টে বথাম দুটো ইনিংসে পঞ্চাশ ওভারের মত বল করে মাত্র ১০৬



বথাম

রান দিয়ে ভারতের ১৩টা ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়নের দরজা দেখিয়ে দিয়েছিল। আর প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড যখন মাত্র ৫৮ রানে তাদের পাঁচটা উইকেট হারিয়েছে সেইসময় খেলতে নেমে বথাম মাত্র ১৪৪ বলে ১১৪ রান করে, সেদিন আমাদের বোলারদের বথাম কি মারটাই না মেরেছিল! তারমধ্যে সুইপ আর পুলশটগুলোতো ছিল দেখবার মত, এই টেস্টে 'ম্যান অব দি ম্যাচ' পুরস্কারটি কে পাবে তা ঠিক করতে নির্বাচকদের যে মোটেই কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছ।

এই ৬ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা বথাম জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে নটিংহ্যামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। আর প্রথম ইনিংসেই নিয়ে নিল ৫টা উইকেট। তখন বথামের ছিল মাত্র ২১ বছর ২৪৭ দিন, সেদিন তার কি আনন্দই না হয়েছিল। তার নীল চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছিল, কিন্তু বথামকে প্রথম টেস্ট খেলার জন্য হয়ত আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হত যদি না তখনকার অধিনায়ক টনি গ্রীগ ইংল্যান্ড দল ছেড়ে প্যাকার দলে যোগদান করত। তবে এখন কিন্তু টনি গ্রীগ ফিরে আসতে চাইলে বথাম আর তাকে জায়গা করে দেবে না।

প্রথম টেস্ট থেকেই বথাম একের পর এক চমক দেখাতে লাগল। গড়তে লাগল নোতুন নোতুন রেকর্ড। প্রথম যে কোন সাতটা টেস্টে বথাম নয় সেঞ্চুরী করেছে নতুবা এক ইনিংসে পাঁচের বেশী উইকেট পেয়েছে। তার মধ্যে আবার লর্ডসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ৩৪ রানে ৮টি উইকেট এবং ১০৮ রান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারপর ২১টা টেস্টের মধ্যে বথাম ১০০০ রান ও ১০০ উইকেট লাভ করে এক দারুণ রেকর্ড করল। এই রেকর্ডটা আগে ভিনু মাঁকড় ২৩টা টেস্ট করেছিলেন। এক প্রচণ্ড সাহস এবং প্রতিজ্ঞা সম্বল করে বথাম এগিয়ে চলেছে। তার এখন অনেক চিন্তা অনেক দায়িত্ব। কারণ সে এখন দলের অধিনায়ক।

তোমরা যে বথামকে জান বা চেনো সে তো শুধু ক্রিকেটার বথাম। কিন্তু বথাম শুধুই ক্রিকেট খেলে না। তবে হ্যাঁ ক্রিকেটই তার প্রধান খেলা। বথাম ফুটবল খেলতে খুব ভালবাসে এবং মাঝে মধ্যে খেলেও। ছোট বেলায়তো ফুটবল ক্রিকেট দুই-ই সমানভাবে খেলত। কিন্তু ক্রিকেটেই যে তার সাফল্যের সম্ভাবনা প্রচুর তা সে বুঝতে পারে সেই ১৪ বছর বয়সেই। সেই সময় সে তার বাবার সাথে পরামর্শ করে এক পেশাদারী ক্লাবে ফুটবল খেলার আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে। শুধুই কি ফুটবল। বথামের এক অত্যন্ত প্রিয় খেলা গলফ। সেই তিন বছর বয়স থেকেই যখন সে ক্রিকেট শুরু করেছে তখন থেকে গলফ খেলাও শুরু করেছে। 'আমার কাছে গলফ খেলার এক বড় কদর আছে। এটা এমনই একটা খেলা যে তুমি নিশ্চিত করে হারাতে পারবে না।' এ কথাগুলো বথামেরই, বথামের বাবা ক্রিকেট, ফুটবল, হকি ভালই খেলতে পারতেন। মা তো ব্যাডমিণ্টনে ইয়র্কশায়ারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সুতরাং বথামও যে অনেকগুলো খেলায় পারদর্শী হবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।

বথামের মন কিছুতেই ঘরে পড়ে থাকতে চায় না। কোন কিছুর মধ্যেই সে বদ্ধ থাকতে চায় না। এই শহর জীবন তার কাছে একটা বিরাট খাঁচার মতন লাগে। তাই যখনই সে ক্রিকেট থেকে ছুটি পায় তখনই তার গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে যায়, তখন, সে একেবারেই গ্রাম্য মানুষ। ছোটবেলাকার সেইসব মাঠের মধ্যে ছোটা ছুটি, গাছে ওঠা এবং নানারকম দুষ্টুমির কথা মনে করতে তার খুব ভাল লাগে। সেখানে সে খেলা করে সারা আর লিয়াম-এর সাথে। তারাও বাবাকে পেয়ে খুব আনন্দ করে। গ্রামে বথামের আর এক বন্ধু এবং সঙ্গী হল তাদের বাড়ীর কুকুরটা। ওকে নিয়ে বথাম বেরোয় খরগোশ শিকার করতে। বথাম বন্দুক চালায়ও দারুণ। শিকার সহজে ফস্কায় না। বথামের আরও একটা শখ হল মাছ ধরা। সপ্তাহের শেষে একটু সময় পেলেই হল বথামকে তুমি তখন সমারসেটে না খুঁজে যদি স্কটল্যাণ্ডে যাও তবে সেখানে দেখতে পাবে বথাম সেখানে স্যামন মাছ ধরতে ব্যস্ত।

এতেই বথামের শেষ নয়, এরপর তার অবসর সময়ের আর একটা বড় আনন্দের উপকরণ হল ওয়াটার স্কীয়িং। এই ওয়াটার স্কীয়িং শিখতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পড়ে ঝড়ে গিয়ে বথাম খুব লজ্জা পেয়েছিল। কারণ বথাম তো হারতে জানে না। ওয়াটার স্কীয়িংয়ে বথাম এতই আনন্দ পায় যে এইজন্য সে একটা স্পীডবোটও কিনে নিয়েছে। এত সব করেও কিন্তু বথাম ক্রিকেট খেলার কথা ভোলে না। তবে এটাও সত্যি যে সারা, লিয়াম, বউ ক্যাথরিন আর এই রোমাঞ্চকর জীবন ছেড়ে ক্রিকেট খেলতে আসতে মনে একটু কষ্ট হয়ই।

তবু আমরা জানি বথাম মানেই ক্রিকেট আর ক্রিকেট মানেই বথাম। তাই আমরা সেই দিনটার অপেক্ষায় রইলাম যেদিন সে বিশ্ব ক্রিকেটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডারের সম্মান পাবে।

[ফটো ঃ—শ্রেণিক শেঠ]

মনের জোরে ফিরে আসা

সৌমিত্র ঘোষ দস্তিদার

দুজনের স্বভাব দু'রকমের। হাঁটা-চলা, কথাবলা, মেজাজ মর্জি—কোন কিছুতেই প্রায় মিল নেই। একজন শান্ত, চাপা, নিরীহ ও মেপে কথা বলতে ভালবাসে। আর অপরজন স্বাভাবিকভাবেই তার বিপরীত। বন্ধুদের নিয়ে আসর জমাতে অল্পসময়ে লোকের সঙ্গে মিশে যেতে বা গরগরিয়ে কথা বলাতে তার জুড়ি মেলা ভার। একজন থাকে দূরে গাঁয়ে, অন্যজন খোদ কলকাতায়।

তবু মহামেডানের দুই বাঘা ডিফেণ্ডারের মধ্যে এমন কিছু মিল আছে—যা চট করে নজরে আসে। যেমন, দুজনেই বয়সে যুবক, একটিমে পাশাপাশি খেলে। খেলার বাইরে যার তার সঙ্গে খুব বেশী



রমেন ভট্টাচার্য

মাথামাখি করেনা, বাড়ীর লোক জনের উপরে অদ্ভুত



গৌরাঙ্গ ব্যানার্জী

টান। এসব খুচরো ব্যাপার বাদ দিলেও রমেন ভট্টাচার্য ও গৌরাঙ্গ ব্যানার্জী'র এমন একটা মিল আছে যা সবার চোখে না পড়লেও, ওরা কখনো ভুলবেনা।

সাতাত্তরে রমেন লাল হলদে জামা গায়ে ময়দানে দাপট দেখাতে শুরু করলেও, শেষ করতে পারেনি। কাগজে বইয়ে নাম বেরোবে, ছবি ছাপা হবে, লোকে দেখলেই 'গুরু' বলে পেছু নেবে—এসব স্বপ্ন নিমেষে বরবাদ হয়েছিল নিজেরই সামান্য ভুলে। পরের বছর বাধ্য হয়েই ফিরেছিল ছোট দল, জর্জ টেলিগ্রাফে। সেই থেকে আজ আশির মাঝামাঝি—এই তিন বছরেই রমেন স্টার ফুটবলার হয়ে উঠল স্রেফ মন দিয়ে প্র্যাকটিস করে। আগাগোড়া উন্নত মানের আরও ভাল খেলতেই হবে—কথাটা মনে রেখে অসাধারণ মনের জোরে।

ওর নিজের ওপর এই অদ্ভুত বিশ্বাস, সাহস, বড় হবার ইচ্ছে, তাক লাগিয়ে আবার বড়টিমে জায়গা করে নেওয়া—এতসব গুণগুলোকে স্বচ্ছন্দে নকল করা যায়—তাই না ?

অবশ্য চাও তো গৌরাঙ্গ ব্যানার্জীকেও আদর্শ হিসেবে বেছে নিতে পার। দক্ষিণ গড়িয়া (গড়িয়া নয়)-র সাধাসিধে ঘরের সাদামাটা ছেলে গৌরাঙ্গও বড় ফুটবলার হয়েছে ওই একগুণে—অসাধারণ মনের জোরে। মাঠের ভিতরে যে দুর্দান্ত গৌরাঙ্গকে আমরা দেখতে পাই তাকে চেনাই যায়না বাড়িতে, মা-দাদাদের সঙ্গে গল্প করার সময় বানিজের ছোটক্লাব ভাঙ্গা পাড়ার সাথীদের ফুটবল বোঝানোর মুহূর্তে। তারচেয়েও অবাক হতে হয় প্রিয় কুকুর 'জে সি'র সঙ্গে খুনসুটি করার সময় ওকে নিতান্ত এক বাচ্চা ছেলে হয়ে যেতে দেখে।

এবার প্রথম দিকে ও ভাবনায় পড়েছিল নিজের টিমে নিজের চেয়েও নামীদের ভিড় দেখে। ভুরু উল্টে লোকে বলেছিল 'গৌরাঙ্গর হয়ে গেল'। যাকে নিয়ে বলা সে শুধু মনে মনে হেসেছিল আর হয়তো ভেবেছিল 'দেখা যাবে।' দেখা গেছে না হয়ে গেছে—তার উত্তর দেবার দায় তোমাদেরই।

তিন প্রধানের তিন সেরা

—দেবাশিস দত্ত

"এই মুহূর্তে কলকাতা মাঠের সেরা খেলোয়াড় কে" ?—এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই হয়ত ইস্টবেঙ্গলের মজিদ বাসকারের নাম বলবে, মোহনবাগান বা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সমর্থকরা এ উত্তর মেনে নাও নিতে পারেন। উল্টে তারা যদি প্রশ্ন করে গৌতম সরকার বা সুরজিৎ সেনগুপ্ত কোন সেরা খেলোয়াড়ের থেকে কমতি যান ? ইস্ট সমর্থকরা কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু হলেও ইতস্ততঃ করবেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে কিন্তু একটা জিনিস জলের মত পরিস্কার লাগবে তা হল মজিদ, গৌতম এবং সুরজিৎ কিন্তু তিন বড় ক্লাবেরই প্রধান ভরসা।

এদের ছাড়া কোন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে নামলে তিন প্রধান বেশ কিছু অংশে নিঃসন্দেহে শক্তিহীন হয়ে পড়বে।

এ বছর দলবদলের সময় বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে মহমেডানে যোগদান করার পর লাল-হলুদ শিবির নিঃসন্দেহে দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক সে সময় মজিদ ও জামশেদ এসে ইস্ট-সমর্থকদের আলো দেখায়। বাস্তবিক এ মুহূর্তে মজিদ ছাড়া ইস্টবেঙ্গল টীমকে ভাবা যায় না। স্বপক্ষে বলতে গেলে বলতে হয় লীগের প্রথম দু তিনটি ম্যাচ খেলার পর মজিদ আলিগড়ে পরীক্ষার জন্য ফিরে যাওয়ায় ক্যালকাটা জিমখানার বিরুদ্ধে মজিদ ছাড়াই ইস্টবেঙ্গল টীমকে মাঠে নামতে হয়। ফরোয়ার্ড লাইন বাস্তবিকই সেদিন অকেজো হয়ে গিয়েছিল। কোনক্রমে ইস্টবেঙ্গল জিমখানাকে ১—০ গোলে পরাজিত করে মূল্যবান দুটো পয়েন্ট ঘরে তোলে। মরশুমের শুরুতেই দু' চারদিন প্র্যাকটিস দেখে প্রশিক্ষক পি. কে. ব্যানার্জী জানান, একটা 'এ্যাসেট' পেয়েছেন। বলো তো উনি



মজিদ

কার সম্বন্ধে বলেছেন? ঠিক ধরেছ। মজিদ অনুশীলনের মাধ্যমে কোচকে সন্তুষ্ট করায় পি. কে. মজিদের সম্পর্কে এ কথা বলেছেন। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে দেওয়া, অনবদ্য রিসিভিং, সতীর্থদের উদ্দেশ্যে মাপা পাস এবং সর্বোপরি সুযোগসন্ধানী হওয়ায় মজিদ এখন ইস্ট-সমর্থকদের হিরো। শুধু স্ট্রাইকার হিসেবেই নয় মজিদ হাফ-ব্যাক পজিশনেও চমৎকার খেলা খেলেন।



গৌতম সরকার

মজিদের মতই গৌতম সরকার সবুজ মেরুন সমর্থকদের হৃদয়ের রাজা। অবিশ্বাস্য গতিতে সারা মাঠ জুড়ে খেলেন এই খর্বকায় খেলোয়াড়টি। খর্বকায় হলে কি হবে, খেলার পরিমাপে কিন্তু মস্ত বড়। দু পায়ে সমান সট। দূরপাল্লার সটে গৌতম যে বহুবার বিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছেন এ কথা তোমরা প্রায় সবাই জান। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ফেডারেশন কাপে গৌতম কি অসাধারণ খেলেছেন তা তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। পরপর তিনদিন একই গতিতে গৌতম দুরন্ত ফুটবল খেলেছেন, গৌতম না খেললে এখন বিনা-দ্বিধায় বলা যায় মোহনবাগান অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে গৌতম ছাড়া মোহনবাগান টীম

গঠন করাই অসাধ্য। অ্যাটাকিং হাফ হিসেবে গৌতমের খ্যাতি সবার উপরে।



সুরজিৎ সেনগুপ্ত

এবছর মহমেডানের প্রথম খেলা বেহালা ইউথের সাথে। টেন্ট থেকে বেরিয়ে একজন অসিত বাগচীর উদ্দেশ্যেই সাইড লাইনের ধারে ঘোরাফেরা করতেই দর্শকাসন থেকে চিৎকার গুরু। গুরু! বলো তো খেলোয়াড়টি কে? আমি কিন্তু সুরজিৎ সেনগুপ্তর কথা বলছি। সুরজিৎ কেমন খেলোয়াড়—একথা আর নতুন করে বলতে হবে না। দর্শকদের গুরু, গুরু, চিৎকারই বলে দেবে সুরজিৎ কত জনপ্রিয় খেলোয়াড়। লাল হলুদ ছেড়ে সাদা কালো জার্সি গায়ে চাপাতেই সুরজিৎ মহমেডান সাপোর্টারদের হিরো হয়ে গেছেন। বস্তুতঃ গোটা মহমেডান দলকেই সুরজিৎ উজ্জীবিত করেন। আশার আলো দেখান। মরশুমের প্রথম গোলটিও পায় মহমেডান এই খেলোয়াড়টির পা থেকেই ফেডারেশন কাপ চলার সময়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য সুরজিৎকে তাড়া করায় সুরজিৎকে হাসপাতালে ভর্ত্তি (কার্টিলেজ ছিঁড়ে যাওয়ায়) হতে হয়। কিন্তু আশার কথা সুরজিৎ আবার মাঠে ফিরে এসেছেন। সাদা-কালোর নয়নের মণি সুরজিৎকে ঘিরে যে ওদের অনেক আশা! ওকে ভালো খেলতেই হবে।

যে কথা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম সে কথাতে ফিরে আসি। মজিদ, গৌতম এবং সুরজিতের উপরই তিনপ্রধানের আশা ভরসা। এঁদের ভালো খেলার উপর দলের ভাগ্য নির্ভর করে। সুতরাং সমর্থকরা এদের ঘিরে সঙ্গত কারণেই আশা করতে পারেন। দেখা যাক 'তিন প্রধানের তিন সেরা" সমর্থকদের কতটা আশা পূরণ করতে পারেন।

[ফটো ঃ— শান্তি সেন ও আশিস মুখার্জ্জী]

আমাদের প্রশ্নের উত্তর

উত্তর দিচ্ছেন মানস ভট্টাচার্য

[আগের সংখ্যা থেকেই বুঝে গেছি, এ বিভাগটি বেশ জমে উঠেছে। তোমাদের প্রিয় খেলোয়াড়দের সাথে যোগাযোগের এর চেয়ে ভাল উপায় আর কি আছে? বর্ত্তমানে ভারতের অন্যতম সেরা ফরোয়ার্ড মানস ভট্টাচার্যের সাথে দেবাশিস দত্তর এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে মানস তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আশা করি এবারে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছ, কিভাবে ঐ বিভাগে প্রশ্ন পাঠিয়ে যোগদান করা যায়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা ঃ—'ঝলমল', পি ৪৩ নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কলকাতা—৫৭]

তিনসুকিয়া, আসাম থেকে তাপস চৌধুরী—

প্রঃ—আপনার আদর্শ ফুটবলার কে?

উঃ—সুরজিৎ সেনগুপ্ত,

বর্ধমান থেকে সত্যজিৎ ও বিশ্বজিত, হাওড়া থেকে তড়িৎ ও বিশ্ব—

প্রঃ—প্রথম ডিভিশনে কবে এবং কোন ক্লাবের হয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটান ?

উঃ—ক্যালকাটা জিমখানার হয়ে '৭৩ মরশুমে।

কোচবিহার থেকে মানসী সরকার, গৌতম সরকার, মৃনাল দাস ও পার্থ দাস—

প্রঃ—কার খেলা আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে ?

উঃ—গৌতম সরকার।

নাকতলা থেকে দীপেন ঘোষ ও রানা ঘোষ, কাঁচড়াপাড়া থেকে সন্দীপ, প্রদীপ ও রাজীব দত্ত—

প্রঃ—সন্তোষ ট্রফিতে প্রথম কবে খেলেন ?

উঃ—১৯৭৬ পাটনা ন্যাশনালে প্রথম খেলি।

ব্যারাকপুর থেকে তথাগত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁচি থেকে সুমনা মিত্র, বাপি মিত্র—

প্রঃ—ভারতের হয়ে বিদেশে কতবার গেছেন ?

উঃ—'৭৭ এ আফগানিস্তানে, '৭৯তে আরব বাহারিনে এবং '৮০ মরশুমে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত প্রি অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করি।

লিলুয়া থেকে মদন সাহা, অশোকনগর থেকে ঝর্ণা দত্ত এবং দুর্গাপুর থেকে মিতা ব্যানার্জী—

প্রঃ—ময়দানে আপনার ব্যক্তিগত বন্ধু কে ?

উঃ বিদেশ বসু, ভাস্কর গাঙ্গুলী এবং চিন্ময় চ্যাটার্জী।

শ্রীরামপুর থেকে ঝন্টু ও বাপী, সল্ট লেক থেকে তপন, প্রবীর, স্বপন ও অধীর—

প্রঃ—প্রথম ডিভিশনে আপনি কবে প্রথম গোল করেন।

উঃ এটা আমার এক স্মরণীয় ঘটনা। '৭৩ মরশুমে ক্যালকাটা জিমখানার হয়ে আমার জীবনের প্রথম খেলায় প্রথম গোলটি করি মোহনবাগানের বিরুদ্ধে।

ধানবাদ থেকে মিতালী ও সোনালী গুহ বিশ্বাস, ক্যানিং থেকে মণীশ পাত্র এবং পার্ক সার্কাস থেকে টুটুল, মিঠুল, পুতুল ও লীলা—



মানস ভট্টাচার্য

প্রঃ—অবসর সময় কিভাবে কাটান ?

উঃ—রেকর্ড প্লেয়ার ও টেপ রেকর্ডে গান শুনে।

কলকাতা থেকে রাজীব ব্যানার্জী, রামরাজাতলা থেকে রামকুমার ভাদুড়ী—

প্রঃ—মোহনবাগান ক্লাব ছাড়ার কথা ভাবছেন কি ?

উঃ—কেন ? খারাপ কিছু তো ঘটে নি।

সুকিয়া স্ট্রীট থেকে শমিতা চক্রবর্ত্তী, মুনমুন চক্রবর্ত্তী—

প্রঃ—প্রথম ডিভিশনে আপনার গোলের সংখ্যা কত ?

উঃ—'৭৯ মরশুমের শেষে ৭৯ টি গোল করেছি।

হাওড়া থেকে প্রণবেশ সরকার, কলেজ রো থেকে সুমিতা সিংহ—

প্রঃ—আপনাকে কোন ঠিকানায় চিঠি দেব ?

উঃ—C/o মোহনবাগান টেণ্ট।

[ফটো—আশিস মুখার্জী]

হকি-সোনা

সুধীরকুমার সেনগুপ্ত

আজকাল খেলাধুলোয় পুরস্কার (মেডেল) দেওয়া হয় তিনরকমের—সোনা, রুপো আর ব্রোঞ্জ-এর। এর ভেতর আবার ইজ্জৎ সর্বাধিক হল অলিম্পিক্‌স্‌-এর পুরস্কারের!

অলিম্পিক্‌স্‌ প্রতি চারবছরে একবার হয়। হয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। এবার হল রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে। একসময় ছিল যখন আমরা হকিতে অলিম্পিক্‌স্‌-এ সোনার মেডেল প্রায় একচেটিয়া করে ফেলেছিলুম। কিন্তু সে দিন চলে গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলন করে অনেক এগিয়ে গেছে। আমরা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারি নি দেখা যাচ্ছে।

শেষবার আমরা হকির সোনা পেয়েছিলুম ১৯৬৪'তে, ষোলো বছর আগে। এবার আমরা আমাদের হকির নবম সোনার মেডেল পেলুম। ১৯৬৪'র আগেও আমাদের দুর্ভিক্ষ গেছে কয়েক বছর। তবে এই ষোলো বছর দুঃসময় চলেছে একটানা।

এবার আমরা সেই হৃত, বিস্মৃতপ্রায় গৌরবের পুনরাধিকারী হলুম। এতে আনন্দ হবার কথাই বটে। আনন্দের আর একটি কারণ, আমাদের প্রতিটি খেলোয়াড় সমান যত্ন করে সমস্ত প্রাণ দিয়ে খেলেছে।

আমাদের খেলার প্রশংসা করে আমাদের বীর প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেন বলেছে: এই মহান্‌ টীমের কাছে হেরে আমাদের কিছুমাত্র আফশোষ নেই।

প্রখ্যাত কলিকাতা-দৈনিক স্টেট্‌স্‌ম্যান বলেছে: অবশেষে দীর্ঘদিন পরে ভারত হকির সম্মান আবার অর্জন করলো। এই জয়লাভ সম্ভব হয়েছে খেলোয়াড় এগার জনেরই শ্রম ও ঘর্ম দ্বারা। এরা প্রতিপক্ষ স্পেনের বিলম্বিত হলেও সুদৃঢ় প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ একটানা লড়ে গেছে।

প্রথম চব্বিশ মিনিট খেলায় জীবন-সঞ্চারই হয় নি তেমন—উভয় পক্ষই যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল। তখন সুরিন্দর সিং প্রথম গোলটি দেয়। মাত্তর ছ মিনিট যেতে না যেতে আবার একখানা চাপালে সেই সুরিন্দর সিং-ই! কিছু পরে কৌশিক তৃতীয় গোলখানা দেবার পরে মনে হল, এখন আর জয়ের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না।

কিন্তু বীর যোদ্ধা স্পেনের ওদিকটা দেখতে তখনো বাকি ছিল। সে মরণ কামড় দিলে তিন গোল খাবার পরে। স্পেনের ক্যাপটেন, চৌত্রিশ বছর বয়সী আমাত, রণং দেহি বলে তেড়ে এল। তিন-এক, তিন-দুই চটপট সে করে ফেললে। তখন আমরা আর একখানা চাপালুম। কিন্তু অক্লান্ত আমাত চেষ্টা চালিয়েই গেল। সে আর একখানা শোধ দিয়ে দিলে (৪—৩)। আর একটা আর হলো না। আমাতের কিন্তু উদ্যমের কিছু অভাব ছিল না। এই সময় আমাদের গোলরক্ষক ছেত্রী কিছু অবধারিত গোল বাঁচিয়েছে (তারও প্রশংসা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই করতে হয়)। রক্ষণ বিভাগে অন্যরাও তাকে সাহায্য করেছে আন্তরিকতার সঙ্গে। আমাতের শক্তিশালী গুলির পর গুলি আর আমাদের বর্ম ভেদ করতে পারে নি। কিন্তু তবুও আমাত ওয়াটারলুর নেপোলিয়নের সম্মান পেতে পারে। প্রায় একক প্রচেষ্টা। তাও চৌত্রিশ বছর বয়সে। অনন্য অবশ্যই বলতে হবে।

আমাত তার গৌরবের উচ্চতম শিখরে উঠে এবার হকি থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

আমাত তিন গোলে পিছিয়ে থেকেও তিনটি গোল করেছে—আর তাও প্রায় একক প্রচেষ্টায়। সে হ্যাট্‌ট্রিক্‌ করেছে। এবছর হকির শ্রেষ্ঠ বীর আমাত, একথা বলা চলে। সে গোলও দিয়েছে এ বছরের সর্বাধিক, মোট ষোলোটি। তার পরেই স্থান পেয়েছে আমাদের সুরিন্দর সিং—সে দিয়েছে ১৫ টি। রক্ষণ বিভাগে আমাদের ছেত্রীর (গোলরক্ষকের) অবদানও অতুল্য। সমালোচকরা অবশ্য আক্রমণভাগেরই প্রশংসা করেছেন সমধিক। উল্লেখ করতে গেলে করতে হয় প্রায় সকলের। এদের জয়ের যা গৌরব, প্রচেষ্টার আন্তরিকতায় গৌরব তার চেয়ে কম নয়। ভেবে দেখতে হবে আমাদের হকির ভেটার্ণ (সুনিপুণ খেলোয়াড়) যারা তারা অনেকেই এবার ছিল না।

কিন্তু আমরা আমাদের খেলোয়াড় ও পরিচালকদের মনে করিয়ে দিচ্ছি—এই জয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকার কিছুমাত্র কারণ নেই। এবার গতবারের সোনা-রুপা-জয়ী দুটি দল—নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া—যোগ দেয় নি। আরও যোগ দেয় নি বর্তমানে হকির তিন প্রধান পাকিস্তান, হল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানি।

তবুও জয় জয়ই—গৌরব কিছুমাত্র এতে ন্যূন হয় নি। এই জয়কে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। খেলোয়াড়দের শিক্ষণ, কালোপযোগী ও প্রয়োজনমতো হওয়া চাই। এদিকে সরকারের, শিক্ষণ-বিভাগের ও খেলোয়াড়দের কোনরকম ত্রুটি না থাকে। সমগ্র দেশ এর পেছনে রইলো। সোনা আমাদের সামনের বছরও চাই-ই।



আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুর দল !

তোমাদের কাছে চিঠি লিখতে বসে প্রথমেই মনে জাগে, আমরা দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কতটুকু কাজ করতে পেরেছি ?

আমাদের সাধ অনেক, সাধ্য সীমাবদ্ধ।

এই ত' কিছুদিন আগে "শিশুবর্ষ" সম্পন্ন হয়ে গেল। আমরা দেশের গ্রামে-গঞ্জে ছুটোছুটি করে শিশু উৎসবে যোগদান করলাম। ছোটদের উৎসাহিত করলাম, নতুন করে কাজের প্রেরণা পেলাম, ছোটদের উৎসাহ দিলাম। নানা অঞ্চলে শিশু-পাঠাগার গড়ে উঠল, নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হল, নতুন করে জঞ্জাল আর আবর্জনা পরিষ্কার করে পল্লী অঞ্চলে খেলার মাঠ তৈরী করা হল। ছোটদের জন্যে নতুন নতুন মঞ্চ তৈরী হল। কিন্তু আমাদের দেশটা এত বড়—ছেলেমেয়ের সংখ্যা এত বেশী যে, আমরা কেউ গর্ব করে একথা বলতে পারবো না যে, দেশে শিশুদের জন্যে অনেক কাজ হয়েছে।

শুভ কাজের সূচনা হয়েছে—এইটুকু শুধু আমরা বলতে পারি। দেশের মানুষ শিশুকল্যাণে যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এই শিশু সংগঠনের বিরাট-যজ্ঞে এগিয়ে আসেন, তবেই খানিকটা উল্লেখযোগ্য কাজ হতে পারে।

অবশ্য শিশুবর্ষে অনেক সাহিত্যিক ছোটদের জন্যে অনেক ছড়ার বই, জীবন-কাহিনী, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে আমাদের দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার "আলোর ফুলকি" শিশু-কিশোর-সঞ্চয়ন রচনা করে সুলভ মূল্যে দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সেটা অবশ্য একটা উল্লেখযোগ্য কাজ।

দেশের ছোটদের কাগজগুলিও বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশ করেছে। তাতে অবশ্য শিশু-কিশোরদের মধ্যে একটা উৎসাহ ও প্রেরণা জেগেছে। আমাদের রাষ্ট্রের আরো সংগঠনমূলক কাজে এগিয়ে আসা উচিত।

একদা রবীন্দ্রনাথ বেদনা-তিক্ত মনে এই কামনা জানিয়েছিলেন যে, এই ইট-কাঠ-লোষ্ট্রে তৈরী নগর-সভ্যতা ফিরিয়ে নিয়ে প্রাচীন ভারতের তপোবন আমাদের ফিরিয়ে দাও।

কবি এবং শিক্ষাবিদরূপে তিনি সত্য কামনাই করেছিলেন।

সেই প্রাচীন ভারতে ছাত্রগণ ভক্তিনম্রচিত্তে তপোবনে গিয়ে গুরুর চরণে প্রণাম করে প্রকৃত শিক্ষার দীর্ঘ ব্রত গ্রহণ করত।

সেই শিক্ষালাভ-কালে শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত।

শুধু যে শাস্ত্রপাঠের ব্যাপারেই এই শ্রম তা নয়, ছাত্রদের কঠিন কায়িক পরিশ্রম করে সমিৎকাষ্ঠ সংগ্রহ করতে হত। গুরুর ধেনুর পরিচর্যা করতে হত। আশ্রমের জন্য বনে-বনান্তরে ঘুরে ফল সংগ্রহ করতে হত। আশ্রমের জন্য কৃষিকার্য করতে হত। এ ছাড়া সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হতে হত। তবেই তাদের শিক্ষা সমাপ্ত হত।

কিন্তু এ যুগের নতুন ব্যবস্থায় বিরাট বিরাট শিক্ষা-সদন নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় ছাত্রদের শিক্ষার ও আন্তরিকতার একান্ত অভাব। শিক্ষকগণও চারিদিকে তাঁদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করেছেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে রাজনীতি এসে পড়ছে। ফলে আমরা শিক্ষার প্রতি অনুরাগ হারিয়ে ফেলছি। দেশের পক্ষে এটা দুঃখের কথা।

শরৎকাল এসে পড়েছে।

সামনে আমাদের শারদীয় উৎসব।

এই উপলক্ষে সব শিশু-পত্রিকাই পূজাসংখ্যা প্রকাশে তৎপর হয়ে উঠেছে।

তোমাদের প্রিয় কাগজ "ঝলমল"-ও পূজাসংখ্যা প্রকাশে এগিয়ে এসেছে। এই বিশেষ সংখ্যায় তোমরা তোমাদের মনোমত গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, কিশোর উপন্যাস, জীবনী ও অজস্র ছবি দেখতে পাবে।

ওদিকে খেলার জগতে যে ক্রিয়াকাণ্ড চলছে তা তোমরা পত্রিকার 'খেলার জগতে' পড়তে পারবে।

যে যেখানে থাকো—সুস্থ দেহ-মন নিয়ে ভালো থাকো, বিদ্যালাভ করে কৃতী হও আর মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করো, এই কামনা জানাই।

কাছের আর দূরের বন্ধুদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি শেষ করছি। ইতি—



তোমাদের চিঠির উত্তর

আনন্দদাতা গুহ (গান্ধীনগর, কোচবিহার) ঝলমল তোমাদের ভালো লাগে জেনে আনন্দিত হলাম। নামটা পরিষ্কার করে লিখবে। ঠিক বোঝা যায় না। এই বয়েসে হাতের লেখাটা সুন্দর করবে। তবেই সুনাম হবে।

হাতের লেখা তোমাদেরই মুক্তা-সম হবে—
সকল জনে আখর দেখে খুশী হবেই তবে॥

বিভাস চন্দ্র মণ্ডল (মেজিয়া, বাঁকুড়া) উড়ো জাহাজ আকাশের বুকে অনেক ওপর দিয়ে উড়ে যায় বলে মাটিতে তার ছায়া পড়ে না। আমার কোন্ বই সব চাইতে ভালো সেটা ত তোমরাই বলবে।

অসিত দত্ত (বাদলকোনা, হুগলী) তুমি ঝলমলের গ্রাহক জেনে খুশী হলাম। এইবারত' চিঠির উত্তর পেলে। আমাদের কাছে লেখা সব চিঠিই আমি পড়ি।

তাপস চক্রবর্ত্তী (মাধব নগর, মালদহ) ঝলমল তোমাদের খুব প্রিয় পত্রিকা জেনে খুব খুশী হলাম। এই পত্রিকা তোমার বন্ধুদেরও পড়তে দাও? বেশ।

ঝলমলে আছে ভাই
ছড়া, ছবি, ছন্দ।

শিশুদল সবে পড়ে,
তাতেই আনন্দ॥

সাধন দাস (ডাকবাংলা পেলস, কোচবিহার) চিঠির উত্তর পড়তে ভালো লাগে জেনে খুশী হলাম। লেখা সম্পাদকের ঠিকানায়, আর শুভেচ্ছা ও উত্তর পেতে আমার ঠিকানায় চিঠি দেবে। ঝলমল কার্যালয়ে সম্পাদককে লিখবে। আমার কাছে লিখবে—২৫, রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ঠিকানায়।

আমিনুল হক (বেনীপুর, মুর্শিদাবাদ) তোমার দীর্ঘ চিঠি পেয়েছি। মন দিয়ে পড়েছি বৈকি। তবে এত বড় চিঠির জবাব ত ঝলমলের পাতায় দেয়া যায় না। তোমার সাহিত্য-চর্চা সাফল্য-মণ্ডিত হোক—এই কামনা জানাই।

লেখা পড়া শিখে তব বেড়ে যাক্ মান।
এ আঁধার দূর করে করো খান্ খান্॥

সত্য নারায়ণ বিশ্বাস, হরি নারায়ণ বিশ্বাস, গৌরী বিশ্বাস, কেয়া বিশ্বাস (রানাঘাট) তোমাদের চারজনের চিঠি এক খামের ভেতর পেয়েছি। তোমরা আমার শুভেচ্ছা চেয়েছ—পাঠিয়ে দিচ্ছি—

পড়ে শুনে সুখী হও
খেলে গড়ো দেহ—
তোমাদের অপযশ
ছড়াবে না কেহ॥

মলয় কুমার দল (কেশিয়াড়ী, মেদিনীপুর) স্বপনবুড়োর চিঠি তোমাদের আনন্দ দেয় জেনে খুশী হলাম। ঝলমলে অনেক নতুন মজাদার লেখা পড়তে পারবে। তোমরা ম্যাজিক অভ্যাস করো জেনে খুশী হলাম। সবাইকে দেখিয়ে আনন্দ দাও ত?

সবাই জেনো যাদুর খেলা
দেখতে ভালো বাসে—
দল বেঁধে তাই দেখতে সবাই
তোমার কাছে আসে॥

স্বপন কুমার বিশ্বাস (রানাঘাট, নদীয়া) তোমরা যদি ধাঁধা তৈরী করো, তা হলে সম্পাদকের কাছে পাঠাবে। নানা ধরনের ভালো বই পড়বে, তাতে আনন্দ পাবে। সত্যিকারের শিক্ষালাভও তাতে হবে।

পথিক মণ্ডল (নিউব্যারাকপুর) তুমি চার লাইনের শুভেচ্ছা চেয়েছ। পাঠিয়ে দিচ্ছি—

তোমরা হবে সরল সোজা
বিদ্যাতে ভরপুর—
দেশবিদেশে নাম ছড়াবে—
সুন্দর-মধুর।

"ঝলমলে" তুমি লেখা পাঠিয়েছ জেনে খুশী হলাম। সম্পাদকের ভালো লাগলে ছাপা হবে।

মজার ম্যাজিক

যাদুসম্রাট্ এ. সি. সরকার

হংকং-এর ম্যাজিক ধাঁধা

জীবনের নানা সময়ে নানা দেশে নানান রকমের রকমের ধাঁধা বা হেঁয়ালির জট ছাড়াতে হয়েছে আমাকে অনেক অনেক বার। এর মধ্যে অনেক রহস্য বা হেঁয়ালি খুবই মজাদার। সেই সব বিচিত্র ধাঁধা বা হেঁয়ালির একটা এখন তোমাদের সামনে এনে হাজির করছি। এই ম্যাজিকের হেঁয়ালি দিয়ে তোমরা খুব সহজেই তোমাদের বন্ধুদের আসর মাৎ করতে পারবে। এই হেঁয়ালিটার রহস্য কিন্তু সে দিন আমি ভেদ করতে পারি নি। কেন, জান? কারণ এটা একটা যাদুর হেঁয়ালি, এক যাদুকরের দেখানো। জেনে শুনেও এ ধাঁধার সমাধান আমি সে দিন খুঁজে বের করে সবার সামনে ফাঁস করি নি—যাদুকর মশাইকে আমি সবার সামনে অপ্রস্তুত করতে চাই নি তো, তাই।

সেবার হংকং সফরকালে একদিন এক চায়ের আসরে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল বিশেষ অতিথি হিসাবে। আসরের শেষ পর্বে একজন বয়স্ক চীনে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে, আমাদের সামনে টেবিলের উপরে দুটো দেশলাই রেখে, বলতে থাকলেন—

"বন্ধুগণ, এই যে দুটো একই রকমের দেশলাই বাক্স দেখছেন, এর একটার মধ্যে একটা মুদ্রা রাখা আছে। যিনি এক বারে ঐ মুদ্রাভরা বাক্সটা তুলে ধরতে পারবেন তাঁকে আমি এই দশ ডলারের নোটটা উপহার দেব।"

কথা শেষে তিনি টেবিলের উপরে একটা চকচকে নোট রাখলেন। একটা বাঁকা হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি এর পর বললেন—

"মিঃ এ, সি, সরকার, আপনি তো একজন বিশ্ব-বিখ্যাত যাদুকর। দেখুন না চেষ্টা করে, পারেন কিনা "

জানি পারবো না, তবুও এগিয়ে তুলে নিলাম একটা বাক্স। নাড়াচাড়া দিলাম, কোন শব্দ হল না। বাক্স খালি। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে অন্য বাক্সটা তুলে নিলেন বাঁ হাত দিয়ে। ঝাঁকুনি দিতেই শব্দ উঠলো—খট্ খট্ খট্…

সবাই বুঝলেন ঐ বাক্সে মুদ্রা ভরা আছে। তিনি দশ ডলারের নোট আর দেশলাই বাক্স দুটো তুলে পকেটে পুরলেন। পরে কী ভেবে বাক্স দুটো আবার টেবিলের উপরে সাজিয়ে রেখে, হেসে বললেন—

"মিঃ এ. সি. সরকারকে আর একটা সুযোগ দেওয়া যাক। হাজার হলেও তিনি আমাদের মান্য অতিথি—একজন বিরাট যাদুকর।"

বলা বাহুল্য, এবারও আমি বিফল হলাম। এবারও খালি ম্যাচ বাক্স হাতে উঠলো!

আসলে ভদ্রলোক খাটিয়েছিলেন এক যাদু কৌশল। ঐ দুই ম্যাচ বাক্সের একটার মধ্যেও মুদ্রা ভরা ছিল না। দুটোই ছিল খালি। একটা তৃতীয় ম্যাচ বাক্সের খালি খোলের মধ্যে একটা মুদ্রা ভরে নিয়ে ভদ্রলোক সেটাকে আগেভাগেই গোপনে তাঁর বাঁ হাতের সঙ্গে (আস্তিনের ভেতরে, আড়ালে) আটকে রেখেছিলেন রাবারের ব্যাণ্ড দিয়ে।

বাঁ হাতে খালি বাক্স ধরে যেই মাত্র তিনি ঝাঁকুনি দিলেন, অমনি নাড়া পেয়ে ভেতরে লুকানো মুদ্রা ভরা বাক্সটা খট্ খট্ শব্দ তুললো। মনে হল, বুঝি হাতে ধরা বাক্সটার ভেতর থেকেই মুদ্রা নড়ার শব্দ হল। আস্তিনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা তৃতীয় ম্যাচের কথা তো কেউ জানতেন না, তাই এই শ্রুতি-বিভ্রম।

চেষ্টা করে দেখ। সাবধানে করতে পারলে এ দিয়ে খুব মজা করতে পারবে!



ধাঁধাঃ কীর্তিমানের জন্মদিনে

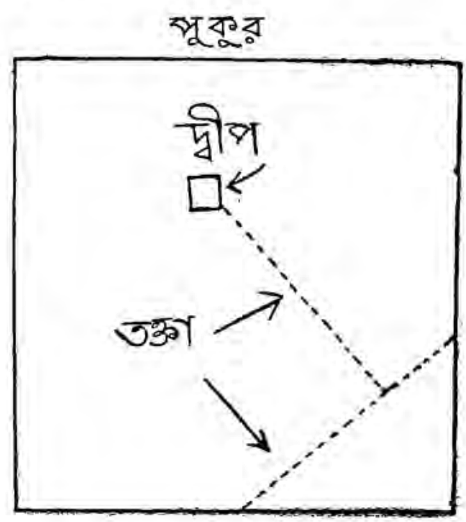
কীর্তিমানের জন্মদিনে ১০ বন্ধুকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে বিকালের জলযোগে। কীর্তিমানের বন্ধুরা কিন্তু এসে বিপদ বাধাল। গোল টেবিল ঘিরে ১০টা চেয়ার সাজানো রয়েছে, কিন্তু বসবার সময় খুবই গোলমাল করতে লাগল তারা। কেউ বলল, সবচেয়ে যে লম্বা সে বসুক এক জায়গায় তারপর তার চেয়ে একটু ছোট বন্ধুক তার ডানদিকে, আবার দ্বিতীয় জনের পাশে বসুক আর একটু লম্বায় ছোট যে সে, এইভাবে সকলে বসুক। অন্য একজন বলল, না-না, সকলে বসুক বয়স অনুযায়ী! একজন বলল, না — যারা চশমা পরেছে তারা বসুক পাশাপাশি—আর যাদের চশমা নেই তারা বসুক বাকি আসনগুলিতে। সমস্যার সমাধান আর হয় না। এই সময় কীর্তিমানের কাকা বললেন, তোমরা যে যেখানে খুশি বসো, আর একদম গোলমাল কোর না। তোমরা আজ যে ভাবে বসবে, অন্য একজন তা কাগজে লিখে রাখবে। তারপর প্রত্যেকে একটা করে কপি নিয়ে বাড়িতে গিয়ে দশজন একটা গোল টেবিলে কত বিভিন্ন ভাবে বসতে পারে হিসেব করবে। প্রত্যেকটা হিসেব একটা কার্ডে লিখবে। বাড়িতে যাওয়ার সময় দোকান থেকে কার্ড কিনে নিয়ে যাবে। কাল আমাকে যে সম্পূর্ণ হিসেব করে কার্ড জমা দেবে তাকে একটা পুরো মোটর সাইকেল কিনে দেব আমি। এখন সব চুপচাপ খেয়ে নাও, গোলমাল কর না।

এখন বলত একটা টেবিলের চার ধারে ১০ জন কত বিভিন্ন ভাবে বসতে পারে? প্রত্যেকটা আলাদা অবস্থানের জন্য একটা করে কার্ড দরকার হলে কতগুলো কারর্ড কিনতে হবে? প্রতি কার্ডের দাম ১ পয়সা হলে কত খরচ পড়বে?

শ্রাবণ মাসের ধাঁধার উত্তর: সুরেনের মামার বোন:

সুরেনের মামার বোন তার মা। নিকট আত্মীয় তো নিশ্চয়ই।

ধাঁধার উত্তরঃ কীর্তিমান নিশ্চয়ই পারবে। পুকুরতো চৌকো তার একটা কোণে একটা তক্তা পেতে তারপর ঐ তক্তার মাঝখান থেকে দ্বীপে পৌঁছনোর জন্য অন্য তক্তাটি পাতা যায়। এই ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে।



শ্রাবণ মাসের নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—শেলী, সীমা ও দাদু, বিরাটী। উজ্জ্বল দাস, বাবু, ছোট ভাই, বোন, দাদা, বেলঘরিয়া। সোমা মণ্ডল, সৌমেন মণ্ডল, পূর্ব রাজপুর।

হাওড়া—সুজাতা, পুলিন, পারুল, পাপিয়া, প্রসাদ, আলপনা, বিশ্ব এবং দেবলা, জে, বি, আর ডি লেন। টুকু খুকু, তাতাই, হাসু, মামণি ও লালটুদা, লিলুয়া। নির্মল কুমার মান্না ও জালালসী।

হুগলী—আব্বাসউদ্দীন ও আলখলজ উদ্দীন, হরিপাল, কাকলি, মহুয়া, প্রগতি, সম্রাট ও প্রতাপ নন্দী, মাহেশ। মৌসুমী, মণ্টি ও সঞ্জয়, শ্রীরামপুর। চামেলী ও বেলা চন্দননগর।

বিহার—ভবদেব কর ও উৎপল কর, চাইবাসা। রবি, কানন, অনিতা, মায়া, শঙ্কর ও সুনীতা সিংভূম।

নদীয়া—ব্রততী বাগচী ও শাশ্বতী বাগচী, মদনপুর। মামণি, পুটুন, দীপক ও ভজা, কৃষ্ণনগর।



অন্ধকারে সবুজ আলো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিমান বললো, এক কাজ করা যাক না স্বপনকে আসল ব্যাপারটা কিন্তু বলবার দরকার নেই। ওকে বলবো, চল্, এমনিই ঝাড়গ্রাম থেকে বেড়িয়ে আসি।

প্রিয়ব্রত বললো। স্বপনকে না নিলে হয় না ?

—কিন্তু বিমান যখন শুনবে তোমাতে আমাতে জিপ গাড়িতে ঝাড়গ্রাম বেড়াতে গেছি, তখন ও কি ভাববে বলো তো ? আমরা ওকে বাদ দিয়ে কখনো কোথাও গেছি ?

—আর তো কিছু নয়, আমার শুধু ভয় হচ্ছে, স্বপন যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে ?

—না, না। ও খুব ভালো আছে। কাল ও তো কলেজে চমৎকার ব্যাডমিন্টন খেললো।

—তা হলে চল্, স্বপনকে ডেকে নেওয়া যাক্।

হঠাৎ ঝাড়গ্রাম যাবার প্রস্তাব শুনে স্বপন বেশ অবাক হলো। খবরের কাগজের ছোট্ট খবরটা স্বপন পড়ে নি। ওকে কিছু জানানো ও হলো না।

বাইরে বেড়াতে যাবার ব্যাপারে স্বপনের খুব উৎসাহ। ও আধ ঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিল। তারপর কলকাতা ছাড়িয়ে বালি ব্রীজের দিকে ছুটে চললো প্রিয়ব্রতর লাল রঙের জিপ গাড়ি।

বালি ব্রীজের কাছেই দক্ষিণেশ্বরে স্বপনের মামা বাড়ি সেখানেই ঘটেছিল দুর্ঘটনাটা।

ব্রীজের ওপর উঠে বিমান হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা স্বপন, তুই কখনো খুব তীব্র সবুজ আলো দেখেছিস ?

স্বপন অবাক হয়ে বললো, সবুজ আলো ? কিসের সবুজ আলো ?

বিমান বললো, না, মানে বলছি যে খুব জোরালো সবুজ আলো হঠাৎ তোর চোখে পড়েছিল ?

স্বপন বললো, হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করার মানে ?

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়েই থেমে গেল। প্রিয়ব্রত ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। অর্থাৎ বিমানের এই প্রসঙ্গটা এখন তোলা উচিত হয় নি।

কথা ঘোরাবার জন্য প্রিয়ব্রত বললো, সবুজ আলো তো সবাই দেখেছে। রেল লাইনের পাশে গ্রীন

সিগন্যাল দেখা যায় না। দূরে থেকে জ্বলজ্বল করে।

ব্রীজ পেরিয়ে ওরা চলেছে দিল্লি রোড দিয়ে। খানিক দূরে গিয়ে বাঁ দিকে আর একটা ব্রীজ পেরিয়ে পাওয়া গেল বম্বে রোড। এই রাস্তায় গেলেই ঝাড়গ্রাম পাওয়া যাবে।

চা খাওয়ার জন্য ওরা থামলো কোলাঘাটে।

স্বপন বললো, প্রিয়দা, তুমি কিন্তু বড্ড জোরে চালাচ্ছো!

প্রিয়ব্রত বললো, এই জিপটা নিয়ে বিশ্বভ্রমণে যাবো কি না, তাই একটু প্র্যাকটিস করে নিচ্ছি!

বিমান বললো, কবে বিশ্বভ্রমণে যাবে, প্রিয়দা? তুমি তো অনেক দিন থেকেই বলছো। এবার দিন ঠিক করো, আমরা তৈরি হয়ে নিই।

— কোথাও যাবি নাকি?

—নিশ্চয়ই?

—তা হলে চল্ এই শীতেই বেরিয়ে পড়ি!

স্বপন জিজ্ঞেস করলো, প্রিয়দা, গ্রীসে যাবে তো? ওঃ, গ্রীস আমার স্বপ্নের দেশ। যতবার ইতিহাস পড়ি, ততবারই আমার মনে হয়, একদিন না একদিন গ্রীসে যাবোই?

প্রিয়ব্রত বললো, ঠিক আছে, তোকে আমরা গ্রীসে রেখে দিয়ে যাবো!

কোলাঘাট থেকে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল ঝাড়গ্রাম। প্রথমেই হাসপাতালে যাওয়া যায় না, তাহলে স্বপন সন্দেহ করবে। কলকাতা থেকে এত দূরে এসে কেউ একটা হাসপাতাল দেখতে যায়!

ডাকবাংলোয় একটা ঘর বুক করলো প্রিয়ব্রত। ঝাড়গ্রাম শহরটার মধ্যেই বড় বড় শাল গাছ। এই সময় ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামায় জায়গাটা আরও সুন্দর হয়ে উঠলো।

স্টেশনের কাছের একটা হোটেলে ওরা ভাত খেয়ে নিল আগে। তারপর প্রিয়ব্রত বললো, বিমান, তুই স্বপনকে নিয়ে ডাকবাংলোতে গিয়ে বিশ্রাম কর্, আমি একটু ঘুরে আসছি। আমার একজন চেনা লোক আছে এখানে, তার সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

বিমান ঠিক বুঝতে পারলো যে প্রিয়ব্রত এই ছুতোয় হাসপাতালটা ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছে। যে-কোনো কারণেই হোক সেখানে স্বপনকে নিয়ে যেতে চায় না প্রিয়ব্রত।

প্রিয়ব্রত অবশ্য একেবারে মিথ্যে কথাও বলে নি। এখানে সত্যিই তার চেনা লোক আছে একজন। এখানকার ডি. এফ. ও অর্থাৎ ডিস্টিক্ট ফরেস্ট অফিসার সুকোমল রায় প্রিয়ব্রতর বন্ধু।

প্রিয়ব্রত চলে যাবার পর বিমান আর স্বপন ডাকবাংলার বারান্দায় দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে স্বপন বললো, প্রিয়দা যার সঙ্গে দেখা কর্তে গেল, তার সঙ্গে আজ দেখা হবে না।

বিমান চমকে উঠে বললো. তার মানে তুই জানিস প্রিয়দা কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে?

—না, তা জানি না।

—তা হলে কী করে বুঝলি দেখা হবে না?

— আমার মাঝে মাঝে এই রকম মনে হয়। প্রিয়দা ফিরে এলে দেখিস তুই, আমার কথা মেলে কি না। জায়গাটা বেশ সুন্দর রে, বিমান। এখানে কয়েকদিন থেকে গেলে হয় না?

—কাল কলেজ খোলা আছে না?

— তা বলে আজ এসে আজই ফিরে যাবো?

—প্রিয়দা বলেছে, সন্ধের পর রওনা হলে আমরা মাঝরাতের মধ্যে ফিরে যেতে পারি কলকাতায়।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর চেয়ারেই হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো স্বপন।

বিমান উঠে পায়চারি করতে লাগলো বাংলোর বাগানে।

তার একটু পরেই ফিরে এলো প্রিয়ব্রত। বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকলো বিমানকে। বিমান কাছে যেতেই সে জিজ্ঞেস করলো, স্বপন কোথায় রে?

—ঘুমোচ্ছে।

—ভালোই হলো। ততক্ষণে কয়েকটা জরুরি কথা সেরে নিই। হাসপাতালে ছেলেটির সঙ্গে দেখা হলো না।

বিমান অমনি একবার চট্ করে পিছন ফিরে ঘুমন্ত স্বপনের দিকে তাকালো। তারপর বললো, আশ্চর্য! স্বপন আগে থেকেই সে কথা কী করে

বুঝলো। যাই হোক, ছেলেটির সঙ্গে দেখা হলো না কেন ?

—আজকের খবরের কাগজে যে খবরটা বেরিয়েছে, সেটা আসলে পুরোনো খবর। ঘটনাটা ঘটেছে আগে! মফঃস্বলের খবর অনেক সময় এরকম দেরিতেই বেরোয়। ছেলেটা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে চলে গেছে!

—যাঃ, তা হলে ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না ?

—আমি ছেলেটার নাম ঠিকানা যোগাড় করে এনেছি। ছেলেটা ঠিক ঝাড়গ্রামের ছেলেও নয়।

—আমরা বলবো আমরা খবরের কাগজের রিপোর্টার। কলকাতা থেকে এসেছি ঐ ছেলেটার রহস্যময় অসুখের ব্যাপারটা জানবারজন্য।

—স্বপনকেও সব খুলে বলতে হয় তা হলে।

—এক্ষুনি জানবার দরকার নেই। বীজপুর নামে এদিকে আর একটা সুন্দর জায়গা আছে, সেখানে একটা ভালো বাংলোও আছে জানি। আজ রাতটা আমরা সেখানেই কাটাবো। বীজপুর যাবার পথেই পড়বে দাহিজুড়ি গ্রাম। সেখানে থেকে আমরা ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে যাবো।



জিপ থেকে লাফিয়ে পড়ল স্বপন (চল্লিশ পৃষ্ঠা)।

দাহিজুড়ি নামে একটা গ্রাম আছে, এখান থেকে চারপাঁচ মাইল দূরে, সেখানে থাকে। ওর নাম শম্ভু মাহাতো, এক আদিবাসী চাষীর ছেলে, বছর দশেক বয়েস।

—এত দূরে এসে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে যাবো না ?

—দেখা তো করতেই হবে। আজ আর তা হলে কলকাতায় ফেরা হচ্ছে না।

—দাহিজুড়ি গ্রামে ছেলেটার বাড়িতে আমরা হঠাৎ যাবো, তারা কী ভাববে ?

—সেটাই ভালো হবে।

—তুই স্বপনকে ডেকে জিনিসপত্তর গুছিয়ে নে। আমি আমার বন্ধু ডি. এফ. ও'র সঙ্গে দেখা করে বীজপুরের বাংলোটা রিজার্ভ করে আসছি।

প্রিয়ব্রত আবার চলে যেতেই বিমান এসে স্বপনকে ডাকলো।

স্বপন চোখ মেলে বললো, যাঃ, কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি ? একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলুম—

বিমান বললো, তোর নাম স্বপন, তুই রোজই

তো ঝড়ঝড়ি স্বপন দেখিস। একেই বলে সার্থক-নামা! তোর ইচ্ছেই পূর্ণ হলো।

—তার মানে?

—আজ আর আমাদের ফেরা হচ্ছে না। আজ রাতটা থেকে যেতে হচ্ছে।

—হুররে! চমৎকার! কিন্তু থেকে যেতে হচ্ছে কেন?

—প্রিয়দার কী একটা কাজ আছে এখানে। আজ হলো না। কাল সকালে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ রাত্তিরে আমরা থাকবো এর চেয়েও ভালো জায়গায়। আরো অনেকটা দূরে বীজপুর বলে একটা জায়গায় এর চেয়েও অনেক সুন্দর একটা বাংলো আছে।

—দারুণ ব্যাপার। আজ রাত্তিরে আমি ঐ বাংলোতে মাংস রান্না করবো।

—তাহলেই হয়েছে আর কি! সে মাংস আর কারুকে খেতে হবে না? শিমুলতলায় গিয়ে সেই যে তুই গতবারে মুর্গী রেঁধেছিলি? উঃ, কী নুনেপোড়া, কী নুনেপোড়া!

—কিন্তু সেবারে আমার রান্না আলুভাজাটা ভালো হয়েছিল, বলু? ভালো হয় নি?

—নে, নে, চটপট আমাদের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিতে হবে। প্রিয়দা'র ক্যামেরাটা কোথায়? বিকেলে আমি রাস্তায় ছবি তুলবো।

—প্রিয়দা যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তার সঙ্গে দেখা হয় নি নিশ্চয়ই?

—তুই আগে থেকে এসব বলিস কী করে রে? তুই কি জ্যোতিষ জানিস নাকি?

—হাঃ হাঃ, বাবা! কায়দা আছে, কায়দা।

প্রিয়ব্রত ফিরে এসে বললো, আমরা বীজপুরে না গিয়ে কাঁকড়াঝোড়েও যেতে পারি। সেটা আরও দূরে, একেবারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে!

স্বপন বললো, তা হলে সেখানেই চলো। জঙ্গলের মধ্যে রাত্তিরে খুব ভালো লাগবে। সেখানে বাঘ আসে?

প্রিয়ব্রত বললো, বাঘ আছে কি না জানি না, তবে হাতি আছে। দু'তিনটে হাতি নাকি কয়েকদিন ধরে খুব উৎপাত করছে।

সে কথা শুনে আরও বেশী উৎসাহিত হয়ে উঠলো বিমান আর স্বপন দু'জনেই। ওরা কেউই আগে বুনো হাতি দেখে নি।

ঝাড়গ্রাম ছাড়িয়ে খানিক দূরে যেতেই রাস্তার পাশে মাইলপোস্টে দেখা গেল দহিজুড়ির নাম। আর মাত্র দু' মাইল দূরে। সেখানে গিয়ে শম্ভু মাহাতো নামের ছেলেটার বাড়ি খুঁজে বার করতে হবে। নিশ্চয়ই তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। খবরের কাগজে যখন ও কথা বেরিয়েছে তখন ছেলেটা তো বিখ্যাত হয়ে গেছে, এখন শম্ভু মাহাতোর নাম বললেই ওখানে সবাই চিনবে।

কিন্তু দহিজুড়িতে গিয়ে শম্ভু মাহাতোর বাড়ি খুঁজতে হলো না ওদের। তার আগেই একটা দারুণ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।

দহিজুড়িতে একটা তিন মাথার মোড় আছে। জিপটা তখনো সেখানে পৌঁছোয় নি, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছে চার পাঁচটা ছেলে। হঠাৎ তাদের দেখে স্বপন চিৎকার করে উঠলো, থামো, থামো, প্রিয়দা, শিগ্গির গাড়িটা থামাও!

ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার!

একটা ছেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে স্বপন বললো, কী আশ্চর্য! আজ দুপুরেই তো আমি এই ছেলেটাকে স্বপ্নে দেখেছি!

কথাটা বলতে বলতেই জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো স্বপন।

তারপর দুটো হাত তুলে খুব জোরে স্বপন বলে উঠলো, সবুজ আলো, সবুজ আলো!

ছেলেদের দলের মধ্যে বছর দশেক বয়েসের একটা ছেলেও ঠিক ঐ রকম ভাবেই দু'হাত তুলে উঠলো, সবুজ বাতি! সবুজ বাতি!

স্বপন দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো ছেলেটিকে! দু'জনেই সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে ধপাস্ করে পড়ে গেল মাটিতে।

(ক্রমশঃ)

পাখি থেকে হাতী

আশাপূর্ণা দেবী



(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাবার নাম ত্রিলোকবিহারী, ঠাকুর্দার নাম ভূলোক-বিহারী, তাঁর বাবা অর্থাৎ প্রপিতামহের নাম ছিল দ্যুলোক-বিহারী। এই পর্যন্ত জানা ছিল গোলোকবিহারীর। কিন্তু এই যে একখানা পুরনো কাগজ আবিষ্কার করেছেন সম্প্রতি। যার উপরে সেই আদ্যিকালের স্টাইলে টানা টানা অক্ষরে লেখা, 'শালতোড় রায়বংশের বংশতালিকা'। তাতে যে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আর বহু বাড়ানো বাড়ানো ভঙ্গীতে কত নামই বসানো রয়েছে। পুরুষদের সবই 'বিহারীর' ব্যাপার। গগনবিহারী, ভুবনবিহারী, অটল বিহারী, হৃদয়বিহারী, হ্যানোবিহারী ত্যানোবিহারী।

এসব থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন গোলোক-বিহারী, বংশের কে কোথায় ছড়িয়ে গেছে। আছে কি নেই। সুবিধে করতে পারেন নি। এখন নিয়ে পড়েছেন একটা জমির ম্যাপ, আর তার মধ্যে একটা বাড়ির নক্সা।

যত দেখছেন তত উত্তেজিত হচ্ছেন।

সেই যে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছেন ওরা যে জঙ্গলের দিকে শিকার করতে গেছে, সেই দিকে কোথায় যেন জঙ্গলের মধ্যে না ওপারে পূর্বকর্তাদের একখানা গোপন দুর্গ ছিল, সেখানে নাকি অনেক অস্ত্রশস্ত্র থাকতো, থাকতো লুকনো সোনাদানা টাকাকড়ি। পাহারায় থাকতো বিশ্বাসী সাঁওতালরা, যারা না কি প্রাণ দেবে তবু প্রভুর একটু জিনিস এদিক ওদিক করতে দেবে না।... যেখানে জমিদার মশাইরা মাঝে মাঝে 'অরণ্যবাসে' যেতেন স্বাস্থ্য ফেরাতে। সেইটা হঠাৎ করে একবার প্রচণ্ড ভূমিকম্পে নাকি মাটির তলায় বসে যায়। আর পরে তার উপর গাছ গজিয়ে গিয়ে সবটাই জঙ্গলে পরিণত হয়ে যায়। এটা কি সেই জঙ্গলে জমির ম্যাপ, আর সেই গোপন দুর্গ গৃহের নক্সা? থানা...সোজা...জমির সীমানা, দাগ নম্বর খতিয়ান ইত্যাদি জটিল জিনিসগুলো যত দেখছেন সন্দেহ বদ্ধমূল হচ্ছে।...অথচ পরিষ্কার ভাবে পড়ে ফেলাও তো গুরুতর ব্যাপার। সেকালে নায়েব গোমস্তার হাতের লেখা, তার ছাঁদই আলাদা। তাও কাগজ তো পাঁপর ভাজা হয়ে গেছে। তাছাড়া ইদানীং চোখের জ্যোতিটাও তেমন যেন জোরালো নেই।

জানলার ধারে নিয়ে এলেন, কিন্তু সুবিধে হল না। মাদুর গোটানো করে গুটিয়ে রাখা কতকালের কাগজ,

তাও বোধহয় সেকালের তুলট কাগজ। তাকে বড় টেবিলের ওপর বিছিয়ে না ফেললে পড়াই যাবে না। এমনি মেলে ধরলে হচ্ছে না। চশমা খুলে চোখটা ভাল করে মুছে নিলেন, চশমাটাও মুছলেন, জমির চৌহদ্দি সীমানা ইত্যাদি বুঝতে বুঝতে প্রায় সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছলেন। হ্যাঁ, ওই জঙ্গলের দিকটাই বটে।

তার মানে ছেলেবেলা থেকে যেটা কিংবদন্তীর মত শুনে এসেছেন, সেটার মধ্যে সত্যতা আছে কিছু।

গোলোকবিহারী বেশ উৎসাহিত, উত্তেজিত এবং রোমাঞ্চিত হচ্ছেন।...বাড়ির নক্সা অপর এক 'মাদুর গোটানো' মত কাগজে পাওয়া গেছে।

প্রায় আশ্চর্যভাবে যে সিন্দুকটা থেকে এটা আত্মপ্রকাশ করেছে সে সিন্দুকের কাগজপত্র তো তন্ন তন্ন করে দেখেছেন, দেখেছে মুকুন্দও। জমিদারী বিলোপের পর 'নায়েব গোমস্তা কাছারিবাড়ি' সবকিছুরই বিলোপ ঘটেছে, কিন্তু পুরনো নায়েব মশাইয়ের ছেলে ওই মুকুন্দ; যে ছেলেটা নাড়ুর এক বয়সী বলে, বলতে গেলে এইখানেই মানুষ হয়েছে ছেলেবেলায় নাড়ুর সঙ্গে খেলেছে, খেয়েছে, সারাদিন থেকেছে।

সেই মুকুন্দই এসে এসে কিছু কাজ করে দিয়ে যায়। এমনিতে বি. ডি. ও অফিসে কাজ করে, কিন্তু মন পড়ে থাকে তার এখানে। নাড়ুর দেখাদেখি গোলোককে মামাবাবুই বলে। সেও তো ওই পুরনো দলিল দস্তাবেজের বোঝা সমস্ত নামিয়ে দেখেছিল। তখনতো চোখে পড়ে নি সিন্দুকের একধারে ছোট্ট একটি পেতলের আংটা চেপটে শুয়ে আছে।

গতকালই হঠাৎ চোখে পড়ল।

আর চোখে পড়তেই বুঝলেন, আছে কিছু ব্যাপার। ধরে টানাটানি করলেন, কিছুই হল না।—বুদ্ধি করে আংটার মধ্যে একটা দড়ি চালিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে তার দুটো মুখ এককরে মারলেন এক হ্যাঁচকা টান, আর সঙ্গে সঙ্গে চড়াৎ করে খুলে এল একটি ডালা। তারমানে সিন্দুকটার মধ্যে একটা লুকনো চেম্বার রয়েছে।

সেকালে লোকে ব্যাঙ্কের 'লকারে' দামী জিনিসপত্র রাখতে যেত না তো, নিরাপত্তার অনেক ব্যবস্থা নিজেরাই বানিয়ে নিত। গোলোকবিহারীর বাবা যে পালঙ্কটায় শুতেন, সেটা বিরাট বড় বলে গোলাকবিহারী শুতে পছন্দ করেন না, এমনি পড়ে আছে একটা ঘরজোড়া হয়ে। গদি ওল্টালে দেখা যাবে সাধারণ তক্তাপাতা। ওমা, সেই তক্তার নিচে দিব্যি একখানি চেম্বার। খাটের তলা থেকেও বোঝা যায় না, ওপর থেকেও বোঝা যায় না, যে জানে, সেই শুধু জানে কোথায় কী কলকৌশল করলে মাঝখান থেকে চড়াৎ করে একটা ডালা উঠে পড়ে, আর ভিতরের গহ্বরের সন্ধান মেলে।

ওই গুপ্ত গহ্বরের উপর গদি তোষোক আর গোটা আষ্টেক বালিশ নিয়ে শুতেন গোলোকবিহারীর বাবা। অতএব তাঁর শরীরের তলায় থাকতো বাড়ির মহিলাদের যত গহনাপত্র। তার মানে তাঁকে 'লাশ' করে না ফেললে আর কোনো চোর ডাকাতের সাধ্য হবে না সে সবে হাত দিতে।

দেখা যাচ্ছে তেমনি কলকৌশল এই সিন্দুকটায়।

ভীষণ দরকারি কাগজপত্র-টত্র এর মধ্যে রাখা হতো মনে হচ্ছে।

সেইখান থেকেই এই বাড়ির নক্সাটি আবিষ্কার করেছেন গোলোকবিহারী। চুরচুর করছে কাগজ, সাবধানে প্রথম পাক খুলতেই যে ছবিটি দেখেছেন, তা'তে মোহিত হয়েছেন গোলোকবিহারী রায়। হ্যাঁ ছবিই। পুরনো কোষ্ঠিপত্রের মত হালকা হলুদ আর ফ্যাকাসে সবুজ রং দিয়ে আঁকা একখানি বাড়ির ছবি। তারমানে যে বাড়ির নক্সা এটি, সেই বাড়িরই আস্ত ছবি।

বাড়িটা অদ্ভুত! অনেকটা যেন মুসলমানদের মসজিদের মত দেখতে। মাথায় গোল গম্বুজ, চারধারে সরু সরু স্তম্ভ। আবার আশেপাশে তেমনি গোল গোল গম্বুজযুক্ত আরো অংশ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে চালাকি, কবরখানার মধ্যে মসজিদ। এটাই হয়তো লোককে ধাঁধা দেবার জন্যে। সবটা মিলিয়ে কিন্তু আয়তনটা গোলাকার। আর সেটা ঘেরা আছে একটি নিশ্ছিদ্র প্রাচীর দিয়ে।...অনেকটা দুর্গের মত। দুর্গের প্রাচীরেও তো দরজা থাকে। লোহার দরজা। এর দরজা কই? তা' এরও কোথাও আছে হয়তো, ছবির সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু 'আছে' কি? গোলোকবিহারী মনে মনে একটু হাসলেন, 'আছে' নয়, 'ছিল'।

ছবিটার তলায় একদা ঘন কালো কালিতে লেখা, এবং এখন ফিকে হয়ে আসা ছাড়া ছাড়া ভাবে যে অক্ষর কটা লেখা রয়েছে, গোলোক বিহারী চট করে তার পাঠোদ্ধার পারেন নি গতকাল। সাবধানে গোল পাকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন, আজ আবার টেবিলে বিছিয়ে পড়লেন, 'গো-পু-তো-গ্রী-হো।'

কী মানে এর?

চশমাটা আবার মুছলেন, আস্তে আস্তে আঙুলের ডগাটা অক্ষরগুলোর তলায় বুলোলেন, ভাবলেন এমন ছাড়া ছাড়া ভাবে লেখা কেন? তারপর অনুমান করলেন, বাড়ির পুরো ছবিটার তলাটা নেবার জন্যেই বোধহয় এমন কায়দা।

(ক্রমশঃ)

ইস্টবেঙ্গলের মনোরঞ্জন

—পার্থসারথি দত্ত

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে শুধু ইস্টবেঙ্গলেরই নয়, মনোরঞ্জন এখন বাংলার তো বটেই ভারতেও এক নির্ভরযোগ্য স্টপার।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মনোরঞ্জন উৎসাহ, আর মনোবল নিয়ে কঠোর অনুশীলনের ফলে আজ এ জায়গায় আসতে পেরেছেন। এই অনুশীলনের একটা দৃষ্টান্ত তোমাদের দিচ্ছি।

'এই এদিকে এসো' ডেকে, গোল লাইন বরাবর দশ গজ দূরে বলটা রেখে প্রায় অর্ধবৃত্তাকার ভাবে বলটাকে ভিতরের দিকে কাটিয়ে জালে জড়িয়ে ফেললেন। আর যাকে ডেবেছেন তিনিও তাকে অনুসরণ করে অপূর্ব নিখুঁত ভঙ্গিতে বলকে গ্যারেজ করলেন অর্থাৎ জালে জড়িয়ে ফেললেন।

তোমরা নিশ্চই ধরে ফেলেছ যে যিনি ডেকেছেন তিনি কে? আর যাকে ডেকেছেন তিনি কে? যারা ধরতে পারে নি তাদের জন্য আমি বলি— যিনি ডেকে ছিলেন তিনি প্রদীপ ব্যানার্জী। যাকে ডেকে ছিলেন তিনি ইস্টবেঙ্গলের 'অ্যাসেট' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

এই শান্ত, লাজুক ও মিতবাক সপ্রতিভ যুবকটি শ্রী ব্যোমকেশ ভট্টাচার্যের ছোটছেলে। বড়ভাই গাঙ্গেশ ভট্টাচার্য ভলিবল খেলেন মেজভাই বাদল ভট্টাচার্য এবারে জর্জ টেলিগ্রাফের অধিনায়ক, আগামী বারের ক্যাপ্টেন 'মনা' নিজ কৃতিত্বে সকলকে টপকে উপরে উঠেছেন। আচ্ছা, ছোটভাই 'মনা' যদি বড়ভাই বাদলকে বল নিয়ে কাটিয়ে জর্জের সীমানায় ঢুকে পড়ে তবে কী মজাটাই না হবে?

বিপক্ষ দলের কাছে মনোরঞ্জন এক মস্ত বাধা। মাঠে মনোরঞ্জনবিহীন ইস্টবেঙ্গলকে দেখলে বিপক্ষ দলের খুশির উদ্রেক হয় কারণ মনোরঞ্জনের নিখুঁত ট্যাকলিং, কিকিং, হেডিং কভারিং—বিপক্ষ দলকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। মনোরঞ্জনের ক্রীড়াশৈলী সকলের মনকে রঞ্জন করে—তাই প্রদত্ত নামটি সত্যিই সার্থক হয়েছে।



মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

মনোরঞ্জন লেখাপড়াতে কম নয় বেলঘরিয়ায় যতীনদাশ বিদ্যামন্দির থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছেন। তিনি স্কুলের গণ্ডী পেরিয়েই ক্ষান্ত হন নি ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজ থেকে বি, এস, সি, ও পাশ করেছেন।

খেলাতে বাড়ীর গুরুজনেরা বাধা দিলেও ওর বড়দার সহায়তায় কিছুটা সময় খেলাতে মনোনিবেশ করতেন।

মনোরঞ্জন প্রথম ডিভিশানে ১৯৭৪ সালে প্রথম খেলেন পুলিস অ্যাথলেট ক্লাবে। সেদিনটি বিশেষভাবে

স্মরণীয়, যেহেতু সেদিনের বিপক্ষে ছিল মোহনবাগান। পরের বছরও একই ক্লাবে থেকে গেলেন। ১৯৭৬ সালে জর্জ টেলিগ্রাফে খেলেছেন। তারপর থেকে মনোরঞ্জন আর ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ ঘটেছে অর্থাৎ ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল অবধি ইস্টবেঙ্গলেই থেকে গেছেন।

এ বছর দলবদলের সময় মাত্র দুদিনে ইস্টবেঙ্গলের স্বনামখ্যাত ফুটবলার—সুরজিৎ, চিন্ময়, শ্যামল, প্রশান্ত, ডেভিড, মিহির, সাব্বির ও ভাস্কর দল ছেড়ে চলে গেছেন। আরও জানা গেল যে দেবরাজ গুরুদেব ও মনজিত ফিরবেন না। এই রকম টলাটলায়মান অবস্থায় তার আদর্শে অটল থেকে রয়ে গেলেন ইস্টবেঙ্গলে, তাকে ইস্টবেঙ্গলের কাণ্ডারী বললে বেশী বলা হবে কি?

মনোরঞ্জনের, উপরে উঠে আসার পথ বুঝি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কণ্টকাকীর্ণ। ১৯৭৫-এ বাংলার জুনিয়ার দলে মনোরঞ্জন খেলেন, কিন্তু পরের বছর মনোরঞ্জন অধিনায়ক নিযুক্ত হলে বাংলা হেরে যায় কুচক্রান্তের জালে জড়িয়ে।

গতবছর অক্টোবরে ভারতের যে দলটি পশ্চিম এশিয়া সফর করে, তাতে মনোরঞ্জনের নাম থাকা সত্ত্বেও মনোরঞ্জন খেলতে পারেন নি কারণ পাসপোর্ট হারিয়ে যায় আই. এফ. এ অফিস থেকে। মনোরঞ্জনকে না খেলিয়ে অন্য কাউকে খেলানো ব্যবস্থা পাকা করার জন্যই এই কারচুপি, কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রতিথযশাসম্পন্ন প্রতিভাধরকে রোখা যায় না—এক্ষেত্রেও গেল না। অতঃপর মনোরঞ্জন ১৯৮০-র প্রাক-অলিম্পিকে খেলার সুযোগ পেলেন এবং প্রমাণ করলেন যে ভারতের পক্ষে তাকে না হলেই নয়।

[ফটো ঃ—আশিস মুখাজ্জী]

সুখ তার সইল না



নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

মাশকভ তার আসল নাম নয়। সবাই তাকে ঐ নামেই ডাকত। লোকটা ছিল খুবই গরীব। প্রাচীন বুখারার পথে পথে সে জল ফিরি করে বেড়াত। তৃষ্ণার্ত পথিকদের সে ঠাণ্ডা জল দিয়ে পয়সা নিত।

একদিন এক তৃষ্ণার্ত তীর্থযাত্রী তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঐ তীর্থযাত্রীর নাম আবু আলী ইবনু সিনা। আবু আলী তার সামনে দাঁড়াতেই মাশকভ তার দিকে ঠাণ্ডা জলের গ্লাস এগিয়ে ধরল।

আবু আলী কিন্তু তক্ষুনি হাত বাড়ালেন না। তিনি বললেন, পিপাসা আমার খুবই পেয়েছে বটে কিন্তু আমার কাছে যে এখন একটাও পয়সা নেই। কি করে তোমার জলের দাম দিই বলতো ?

মাশকভ কী যেন একটু ভাবল, তারপর বলল, সত্যিই তোমার কাছে পয়সা নেই ?

না—আবু আলী বললেন, অনেকদিন থেকেই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পয়সাকড়ি সব ফুরিয়ে গেছে।

মাশকভ তবুও তাঁকে জল দিতে গেল। কিন্তু তিনি আবারও বললেন, তুমি তো আমাকে জল দিচ্ছ কিন্তু পয়সার কি হবে ?

পয়সার আর কি হবে ?—মাশকভ বলে, আগে তো পিপাসা মেটাও, তারপর পয়সার কথা ভাবা যাবে।

কথাটা বলেই মাশকভ তাঁকে জল দিল। সে যে তাঁকে শুধু জল খেতে দিল তাই নয়, আরো সে বাড়িতে তাঁকে এক রাত্রি থাকতেও দিল।



…মাশকভ তাঁকে জল দিল।

পরদিন সকালে বিদায় নেবার সময় আবু আলী বললেন, তোমার আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ। সত্যি তোমার হৃদয় আছে। আমার কাছে তো কোন টাকা পয়সা নেই কিন্তু আমি আজ তোমাকে একটা মূল্যবান জিনিস দিয়ে যাব।

এই বলে তিনি মাশকভের হাতে একটা ছোট্ট খাতা দিলেন এবং বললেন, এর মধ্যে একটা ওষুধ তৈরি

করার নিয়মকানুন লেখা আছে। এই ওষুধে প্রায় সব রোগই সারবে। সুতরাং তুমি এই ওষুধ বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, তোমার মত গরীব যারা তুমি তাদের বিনামূল্যে ওষুধ দেবে। খুব সাবধান, আমার এই কথা কক্ষনো ভুলে যেও না।

তীর্থযাত্রী আবু আলী চলে গেলেন।

মাশকভও ওষুধ তৈরির কাজে লেগে গেল।

খুব শীঘ্রই সে বুখারার একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে গণ্য হল। প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হল সে।

কিন্তু কিছুদিন পরে বোধ হয় সে আবু আলীর কথাটা ভুলেই গিয়েছিল তা নয়ত গরীবদের কাছ থেকেই বা সে ওষুধ দিয়ে পয়সা নেবে কেন? ফলে যা হবার তাই হল। মাশকভ তার ওষুধ তৈরি করাও ভুলে গেল। আর আবু আলীর দেওয়া সেই খাতাখানাও কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আর খুঁজে পেল না। সঞ্চিত অর্থ সম্পদই বা আর কতদিন থাকে? কিছু-দিনের মধ্যেই সে আবার গরীব হয়ে গেল। বুখারার পথে পথে আবার সে ঠাণ্ডা জল ফিরি করে বেড়াতে লাগল।

মশা ধরা

মতি মুখোপাধ্যায়

ইরাক থেকে মীরার মেসো
কুলটি এসে করেন গোঁসা,
তোদের দেশে আসতো কেরে,
জানলেও আগে এমন মশা!
রক্তচোষা বাদুড় ওরা,
জব্দ আমি করতে পারি,
আজকে রাতে দেখবি মজা,
ওদের মাঝে আনবো মারী।
মীরার মেসো বাজার থেকে
আনেন কিনে ইয়া মশারি,
সন্ধ্যা হতে খাটিয়ে রেখে
করেন তিনি আঁধার জারি।
চারটি ফুটো চারটি দিকে
ইচ্ছা মতো তাঁরই করা,
পাশের ঘরে বলেন হেসে,
জাল পেতেছি পড়বে ধরা।
ভোর না হ'তে ফিলিট হাতে
ঢোকেন মেসো উজ্জল মুখে,
এক মশারি মশা মারেন
ফিলিট দেগে মনের সুখে।



চিল, খট্-খটাং এবং মৌবন্দী

হরপ্রসাদ মিত্র

হ্যাঁ, দু-তিন বছর হোলো এমন। ৩০ এ অক্টোবর ১৯৭৪ সাল। তিরুচ্চিরপল্লী—যার পুরোনো নাম ত্রিচিনপল্লী, সেই স্টেশনে একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে-ছিলুম, সকাল তখন নটা হবে।

একজন এসে বললেন—শ্রীরঙ্গনাথম্ মন্দির দেখেছেন?

আমি বলেছিলুম—না, দেখি নি এখনো, দেখতে যাবো।

বেরিয়েছিলুম মন্দির দেখতে। দক্ষিণ-ভারত মন্দিরময়। সেই মন্দির থেকে বেরিয়ে রক-ফোর্ট নামে প্রাচীন দুর্গের সেই পাহাড়ের নিচে রুপোর গণেশ বিগ্রহটি দেখি। সব চেয়ে ভাল লেগেছিল কাবেরী নদী!

সেই রাত্রে মিটার গেজের লাইন থেকে আবার বড়ো লাইনের ট্রেনে উঠেছিলুম। তখন নটা বেজে গেছে। সারা দিনের ক্লান্তিতে আমার ঘুম এসেছিল! যখন মশার কামড়ে ঘুম ভাঙলো তখন দেখি গাড়ি চলছে না। আমাদের গাড়ি চলে গেছে। যে বগি-তে ছিলুম সেটা দাঁড়িয়ে আছে ইরোড্ জংশনে।

ইরোড্ জংশন বেশ বড়ো স্টেশন। কিন্তু রাত-বারোটা থেকে ভোর পর্যন্ত স্টেশনে পায়চারি করবার অভিজ্ঞতাটাই স্টেশনের চেয়ে বড়ো হয়ে আছে আমার মনে। সেখানে সারা রাত লোক আসছে-যাচ্ছে। তামিলভাষী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ইংরেজীতে আলাপ হোলো। দু'জনে কফি খেলুম। মানুষ এই বিশাল ভারতবর্ষে নানা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু রাজনীতি, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিভেদ সত্ত্বেও মনের গভীরে একটা মিল আছে।

'একথা এইজন্যে বলছি যে, হঠাৎ, রাত প্রায় সাড়ে-তিনটে নাগাদ তিনি বললেন, 'মশাই, পাখিরা ডেকে উঠলেই আমি মনে জোর পাই। এখুনি পাখি ডাকবে—ভোর হবে।'

আমি বললুম—কেন, রাতের চুপচাপ ভাব আর আকাশের নক্ষত্রগুলো আপনার ভাল লাগে না?

তিনি বললেন—নক্ষত্র দেখি বটে, কিন্তু ওরা তো অনেক দূরের আলো। পাখিরাই আমার কাছের নক্ষত্র—they are my near stars! মানুষ ভাষা চায়, পৃথিবীরই ভাষা!

আমি এরকম কথা শুনি নি আর কোথাও। ভারি অবাক্ লাগলো। ভদ্রলোক একটা সরকারী আপিসে কাজ করেন—মাইনে পান শ'চারেক টাকা। তাঁর তিনটি ছেলের মধ্যে প্রথম ছেলেই কাজ পেয়েছে। অন্য দুটি তখনো নাবালক। স্ত্রী আছেন, খুব ধর্ম-প্রাণা মহিলা তিনি। অল্প মাইনের চাকরিতে বছর-পঞ্চাশবয়সে একজন শিক্ষিত সংসারী মানুষ সাধারণতঃ বিরক্ত হ'য়ে থাকে। তাঁকে বিরক্ত দেখি নি। তাই তাঁর কথা ভুলতে পারি না। আর নক্ষত্রের চেয়ে পাখিদেরই তিনি পছন্দ করেন, এটাও কি ভোলা যায়?

ভোর হোলো। তিনি চলে গেলেন। আমি কাবেরীর একটি শাখা নদী কাছেই আছে শুনে তোয়ালে লুঙ্গি সাবান-তেল নিয়ে স্নান করতে গেলুম। হাত-মুখ ধুয়েছিলুম স্টেশনেই। নদীতে যাবার পথে সেই সকালে একটা দোকানে ঢুকে ইদ্‌লি খেলুম।

নদী অগভীর মনে হোলো, তবে বেশ স্রোতের টান আছে। পাশেই শ্মশান,—তার পাশে ধোপাদের কাপড় কাচার জায়গা। জায়গাটা চমৎকার কিন্তু।

মৃতদেহ সৎকার করতে শার্ট-ভেস্তি-তোয়ালে-পরা অনেকগুলি ভদ্রলোক এসেছেন ঘাটে। কেউ কেউ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে বসেছেন।

ধোপরা কাপড় কাচছে। আমি একটা বেশ বড়ো কালো পাথরে সাবানের কৌটো, তোয়ালে-লুঙ্গি রেখে জলে গা ডুবিয়ে স্রোতের টানটা অনুভব করছি।

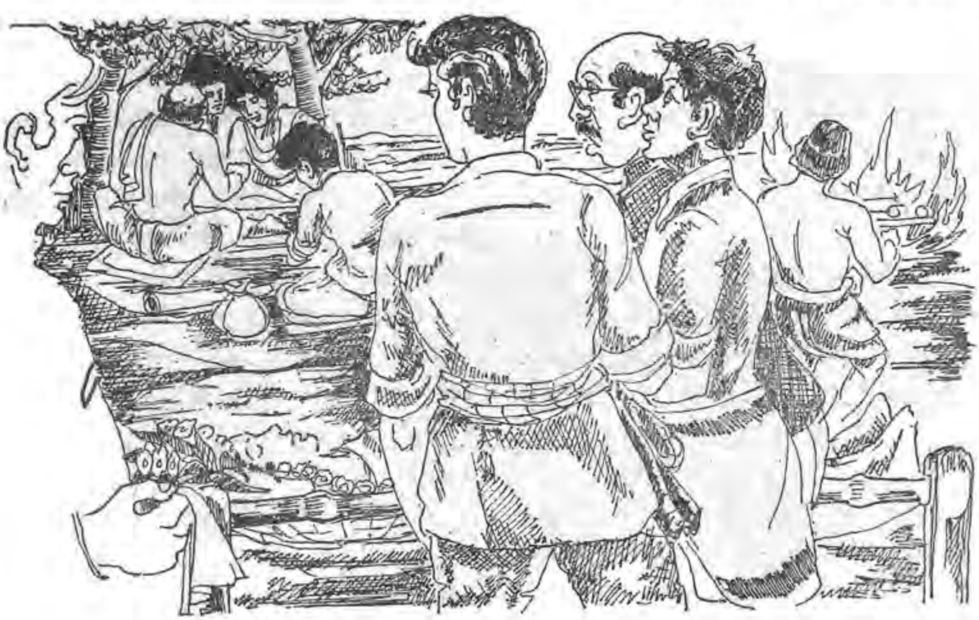
সেই সময়ে আমার সাবানের কৌটোটা একটা বড়ো চিল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা যেন কিছুই না, এইরকম একটা বোধ ছিল আমার মনে সেদিন। নদীর জলের স্রোতে শরীর ডুবিয়ে রাখাটাই সুখ। এই সুখের সঙ্গে আরো সুখ ছিল। কন্যাকুমারীর সমুদ্রজলে এর চেয়ে বড়ো বড়ো পাথর

সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা। এবং ক'দিন আগেই রাত দুটো নাগাদ আমি যখন সেই সমুদ্রের ভেতর-পর্যন্ত-এগিয়ে-যাওয়া একটা উঁচু পুলের ওপর দাঁড়িয়েছিলুম, তখন ঢেউয়ের শব্দে আমরা তিন সহযাত্রী স্তব্ধ তিনটি মূর্তির মতো একেবারে নির্বাক হয়ে যাই। কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছিলুম না বলেই কেউ বলি নি কিছু। কিন্তু প্রকৃতি যে কী পরমাশ্চর্য বিশাল এবং আমরা মানুষরা যে সেই প্রকৃতিরই সন্তান মাত্র, এইরকম অনুভব জেগেছিল প্রত্যেকেরই মনে। জলকণাগুলো ঢেউয়ের ফণা থেকে ছিটকে, সেই উঁচু পুলে পৌছে ভিজিয়ে দিয়েছিল আমাদের। আকাশে চাঁদ ছিল। এবং জ্যোৎস্না রাত্রে দু'একটি জ্বলজ্বলে নক্ষত্রও ছিল।

খট্‌খটাং করে কেবলি বাজতে থাকে এবং বোধ হয় সাবানচোর খেয়ালী চিলের মতোই আমার ভেতরে একটা উড়ন্ত অবুঝ পাখি আছে।

পরদিন ৩১-এ অক্টোবর বুড্ডিরেড্ডিপেট্টি স্টেশনে পেঁছোই। ট্রেন থেকে নামি নি সেখানে; কিন্তু ছোট হলদে চন্দ্রমল্লিকার মতন ফুল ছিল অনেক। তাকে ওখানকার লোকে বলে 'মৌবন্দী'। আমি আমাদের রজনীগন্ধাকেও 'মৌবন্দী' বলতে শুনেছি। পাঁচ পয়সার একগোছা সেই ফুল কিনেছিলুম। তারপর লোকুর নামে ছোটো একটা স্টেশনে পেঁছোই যখন, সে কী চাঁদের আলো সেখানে!

তারপর জালারপেট বা জোলারপেট্টাই স্টেশনে



কেউ কেউ শ্রদ্ধাদি অনুষ্ঠানে বসেছেন। (সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা)

ইরোডের কাবেরী-রোড, মত্তপমু-রোড ইত্যাদি পথগুলো পেরিয়ে সেই যে সেদিন শ্মশান-ঘাটের পাশে স্নান করেছিলুম এবং একটা চিল আমার সাবানের কৌটো ঠোঁটে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল,—তারপর, অটোরিক্শায় উঠে আবার স্টেশনে অন্য ট্রেনে উঠে সালেম-জংশনে গিয়েছিলুম, সেইসব বৃত্তান্তের মধ্যে বিশেষভাবে অদ্ভুত সেই চিলটা জেগে আছে। তার পরেই দংশুপেট প্রভৃতি কয়েকটা স্টেশনের পরে মকাই ক্ষেতের ছড়ানো একটা জায়গা জেগে আছে। তার পাশে পাহাড়ের দেয়াল। বিকেলের রোদ্দুরে খানা-ডোবার মধ্যে তালগাছের ছায়া। জগৎ সত্যিই ভারি সুন্দর। এই একটা বাজনাই বেড়াতে বেরুলে আমার মনের মধ্যে রেললাইনে ট্রেনের চাকার শব্দের মতো পেঁছোই। তখন রাত সাড়ে-নটা। এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোলো সেখানে। তিনি বাঙ্গালোর থেকে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ঘোড়াদের কামরায় তারা বহাল তবিয়তে আছে কিনা, সেই দিকেই তাঁর মন। তিনি চাঁদের দিকে তাকান নি, আকাশ তাঁর কাছে তুচ্ছ। মৌবন্দী ফুলগুলি আমি তাঁকে উপহার দিতে তিনি কিন্তু খুবই খুশী হয়েছিলেন। তাঁর কাছেই শুনি যে, দু'বছর বয়স থেকেই ঘোড়ারা দৌড়ের খেলায় নামতে পারে এবং আড়াই বছর বয়সেই বেশ বাজী জিততে পারে।

আমি তাঁর সঙ্গে ঘোড়ার কামরায় গেলুম। ঘোড়াদের লম্বা লম্বা গালে আদরের চাপড় দিলেন তিনি—তারপর সেই মৌবন্দী ফুলগুলি তাদের চিবোতে দিলেন।

বিভূতিভূষণ ও কয়েকটি অসাধারণ ঘটনা

—দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়

আগামী ২৮শে ভাদ্র বিভূতিভূষণের জন্মদিন। ঐদিন তাঁকে স্মরণ করবে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠক ও পাঠিকা। এই উপলক্ষ্যে বিভূতিভূষণের জীবনের কয়েকটি অসাধারণ ঘটনার কথা মনে এল। এগুলোর মধ্যে অনেক ঘটনা আমার অগ্রজা শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি—যিনি ব্যক্তিগত জীবনে বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী। একটি ঘটনার সাক্ষী আমার ছোটমামা শ্রী নিরঞ্জন চকবর্তী। বিভূতি রচনাবলীর সম্পাদক ও গবেষক আমার দাদা শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে এই ঘটনাগুলোর সব ক'টিই বাস্তব সত্য।

প্রথমেই বলে নিচ্ছি যে এখানে আমি কোনও ভূতের গল্প বা অলৌকিক কাহিনী লিখতে বসি নি। যদিও এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনার আমি এখনো সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নি। তাই সাধারণ বুদ্ধিতে এদের অসাধারণ বলেই মনে হয়।

বিভূতিভূষণ লেখার কয়েকটি লক্ষণের মধ্যে ছিল অসাধারণ প্রাকৃতিক বর্ণনা। সুযোগ পেলেই তিনি মাঠ ঘাট, নদীনালা, বনজঙ্গল ও পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন। তাঁর অনেক লেখায় এই ঘুরে বেড়ানোর কথা আছে। কখনো তাঁর সঙ্গে সঙ্গী থাকত—আবার অনেক সময় একলা বেরিয়ে পড়তেন।

১৯৪৯ ও ১৯৫০ খৃীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গ্রীষ্মের ও শারদীয় ছুটিতে বিভূতিভূষণ সস্ত্রীক বিহারের সিংভূম জেলার ঘাটশিলায় গিয়েছিলেন। তখন তাঁর একমাত্র পুত্র তারাদাস ওরফে বাবলু বছর খানেকের শিশু। ঘাটশিলায় সুবর্ণরেখা নদীর ধারে বিভূতিভূষণের এখনও ছোট একটি বাড়ি আছে। এখানে তাঁর ছোটভাই নুটবিহারী ডাক্তারি করতেন। বিভূতিভূষণের বাড়ি গৌরীকুঞ্জ থেকে সুবর্ণরেখার ওপারে কালাঝোড় পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যেত; সকালে বা বিকেলে তিনি বাবলুকে কাঁধে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। কখনো অপরাহ্ণে তিনি তাঁর মামাশ্বশুর নিরঞ্জন বাবুরা অন্য কারো সঙ্গে ফুলডুংরি পাহাড়ের দিকে ও সুবর্ণ রেখা নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন। ফুলডুংরি একটি ছোট্ট টিলা। কাছেই এদেলবেড়ে রিজার্ভ ফরেস্ট, যেখানে একটি বাঁধ বা প্রাকৃতিক হ্রদ আছে। সূর্যাস্তের সময় বা, পূর্ণিমার রাতে এখানকার দৃশ্য হয়ে উঠত অপূর্ব। প্রায় তিরিশ বছর আগে এসব জায়গা আরও নির্জন ছিল।

বিভূতিভূষণ তারাভরা অন্ধকার রাতের আকাশের নীচে মুক্ত প্রান্তরে বা মাঠে একলা শুয়ে থেকেছেন কোনো বাহাদুরির লোভে নয়। রাতের আকাশ ও মাঠকে ভাল করে দেখার জন্য তিনি ঐরকম করতেন। সিংভূমের পাহাড়ী অরণ্যে সন্ধ্যার পরে ভালুকের ভয়ে গাছে উঠে দূর থেকে ভেসে আসা ময়ূরের কেকাধ্বনি শুনেছেন। রাত দুটোয় উঠে শীতের জ্যোৎস্নায় কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে গভীর জঙ্গলে বেড়াতে গেছেন। বনের মধ্যে নিরক্ষর কোনোও মুণ্ডা বা হো আদিবাসীর সঙ্গে মাটিতে বসে মকাই বা ভুট্টা খেয়েছেন। তখন কে বলবে তিনি একদা ডিস্টিংশনে বি, এ, পাশ করেছেন। এমনই নিরহঙ্কার সাদাসিদে মানুষ ছিলেন তিনি। বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া বিভূতিভূষণ নামটি তাঁর সার্থক হয়েছিল।

দেহাবসানের কিছুদিন আগে তিনি আনমনে ঘাটশিলার বনের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে একদিন একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখেন। সময়টা ছিল বিকেল—হয়তো বা সন্ধ্যার কিছু আগে। নির্জন ঝোপঝাড়ের মধ্যে এক জায়গায় একটি খাটিয়া ও তারপাশে একটা ভাঙ্গা কলসী দেখতে পান। ভয়ার্ত বিভূতিভূষণের

চিৎকারে তাঁর মামাশ্বশুর এগিয়ে আসেন। পরে তিনি বলেন যে খাটিয়ায় যেন তিনি নিজে শুয়ে আছেন বলে তাঁর মনে হয়েছিল। এই ঘটনার কিছুকাল পরে ঘাটশিলাতেই তিনি পৃথিবীর মায়া কাটান। ঐ সময়ে তার মামাশ্বশুরের লেখা এই ঘটনাটি সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

বিভূতিভূষণের ছাত্রজীবনে কলকাতায় শেয়ালদার কাছে রিপন কলেজে পড়তেন। এখন এই কলেজটির নাম হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। ছাত্রাবস্থায় অনেক সময় তাঁকে কষ্ট করে পড়াশুনো করতে হয়েছিল। তার কারণ, তাঁর বাবা মারা যাবার পর তাঁর নিজের ভার নিজেকেই বইতে হত। তার ওপরে দেশে থাকতেন বিধবা মা ও ভাইবোনেরা। কাজেই অনেক কারণে ঠিক সময়ে কলেজের মাইনে দেওয়া হয়ে উঠত না! আই, এ, পরীক্ষার আগে কয়েকমাস কলেজের মাইনে দিতে না পারায় তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে যায়। কারণ, মাইনে বাকি থাকলে পরীক্ষা দেওয়া হয়ে উঠত না। ঐ সময়ে একদিন কলেজে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন যে অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর নামও নোটিস বোর্ডে পরীক্ষার্থী হিসেবে রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি কোনও কেরানীবাবুর ভুলে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভুলের জন্য বিভূতিভূষণ ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে আই, এ পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে প্রথম বিভাগে পাস করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি কলেজের মাইনে সব শুদ্ধ মিটিয়ে দিতে পেরেছিলেন। এই ঘটনাটি আমার মেজদি রমাদেবীর (ডাক নাম কল্যাণী) মুখে শুনেছি। তাঁকে আবার বিভূতিভূষণ নিজের মুখে বলেছিলেন। তাছাড়া 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর জীবনে অনুরূপ একটি ঘটনার বর্ণনা আছে। ঘটনাটি ছোট্ট, কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বলতে হবে। কারণ, পরীক্ষা না দিতে পারলে বিভূতিভূষণের পরবর্তী জীবন কোন খাতে বইত তা কে বলতে পারে?

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আমি বনগ্রামের কাছে বিভূতিভূষণের পৈতৃক ভিটে বারাকপুর গ্রামে গরমের ছুটিতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে যাই। তখন আমি নিচু ক্লাসে পড়ি ও বয়সে বালক ছিলাম। সেসময় তিনি সপরিবারে সেখানে থাকতেন এবং কাছেই গোপালনগর হাই স্কুলে পড়াতেন। বাড়িতে ছিলেন আমার মেজদি এবং অবশ্যই ছোট্ট ভাগনে বাবলু—যার ভাল নাম তারাদাস। আশেপাশের অনেক লোক সবসময় আসত ও গল্পগুজব করত। ইচ্ছামতীর কালো জলে সাঁতার কেটে স্নান করা ও নৌকো বাওয়ার আনন্দে এখনো ভুলি নি। তখন কুঠির মাঠে ঘন ঝোপঝাড় ছিল—শীতকালে নাকি বাঘ আসত। ভয়ে আমি সন্ধ্যের পরে খাট থেকে নামতে চাইতাম না। রাতে খেয়ে উঠে বারান্দায় মুখ ধোওয়ার সময় চাঁদের আলোয় বাঁশঝাড়, চাঁপা গাছ ও এড়াঞ্চি ঝোপের আড়ালে বাঘ বসে আছে মনে হলে মেরুদণ্ড সিরসির করত! এখন সেখানে বিদ্যুতের আলো এসে গেছে পিচের রাস্তায় বাস চলে। কিন্তু মাঝেমাঝে এখনো ছেলেবেলার সেই দিনগুলোকে ফিরে পেতে ইচ্ছে করে।

যাই হোক, ঐ সময়ে বিভূতিভূষণ তাঁর 'ইছামতী' উপন্যাস লিখছিলেন। একদিন বিকেলে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছিলাম। বালক হলেও তিনি আমাকে মোটেই অবহেলা করেন নি—যেমন বড়রা অনেকে করেন। কঞ্চি হাতে বেড়াতে বেড়াতে তিনি আমাকে 'পথের পাঁচালীর' বিখ্যাত সলতেখাগী আমগাছটি দেখিয়েছিলেন। আমি অবশ্য তখন তার গুরুত্ব ভাল করে বুঝতে পারি নি। আরেকটি ছোট ডোবা দেখিয়ে বলেছিলেন ওইটি দেখে হঠাৎ তাঁর আরক গল্পটি লেখার কল্পনা মনে এসেছিল। গল্পটি প্রথমে কিশোরদের মাসিকপত্র মৌচাকে বেরিয়েছিল। এই 'আরক' ও পুজো-বার্ষিকীতে লেখা 'মেডেল'—দুটি গল্পই অলৌকিক কাহিনী কিন্তু এত ভালো গল্প যে আমি এখানো মাঝে মাঝে পড়ি।

বারাকপুর গ্রামে একবার শৈশবে শিশু বাবলু ওরফে তারাদাসের টাইফয়েড জ্বর হয়। ঐ সময়ে বিভূতিভূষণ বাবলুর শিয়রে বসে প্রার্থনা করতেন মেজদির মুখে শুনেছি। ইতিহাসের হুমায়ুন ও আকবরের মতো বিভূতিভূষণও প্রার্থনার জোরে বাবলুকে রোগমুক্ত করেন। ঘটনাটি নিছক কল্পনা নয়—সে সময়ে যাঁরা বিভূতিভূষণকে দেখেছেন তাঁরা সকলেই এটা বিশ্বাস করেন।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল ঘাটশিলার কাছাকাছি

সিংভূমের গভীর অরণ্যে। এখানকার সারাণ্ডা নামের জঙ্গল বিখ্যাত। সেখানে বাঘ তো বটেই, হাতি পর্যন্ত আছে। ঘাটশিলার কাছাকাছি অঞ্চলে ধারাগিরি প্রপাত, সিদ্ধেশ্বর ডুংরি ও কালাঝোড় পাহাড়ের শ্রেণী। তামার খনি ও লোহা পাথরের খনি প্রভৃতি বছর ত্রিশ আগেও দুর্গম জায়গা ছিল। বিভূতিভূষণ গভীর অরণ্যে দিনের পর দিন গিয়েছেন। যেখান থেকে লোকালয়ে পৌঁছতে গেলে সারাদিন কেটে যায়। এমনি এক নির্জনে একদিন দিনের বেলায় জনা দুই আদিবাসী মেয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মেয়েরা তাঁকে যত্ন করে শালপাতা বিছিয়ে ভাত, ডাল ও পোস্তর রান্না খাইয়েছিল। বিভূতিভূষণ খেয়েদেয়ে খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়িতে এসে আমার দিদিকে ঘটনাটি বলতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে খটকা জাগল। গভীর বনে যেখানে তিনি রান্না করা ডাল ভাত ও পোস্ত খেয়েছিলেন তার আশে পাশের কয়েক মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম বা বসতি ছিল না। মেয়েরা তো দূরের কথা—পুরুষরা পর্যন্ত বাঘ, হাতি ও ভালুকের ভয়ে টাঙ্গি না নিয়ে সেখানে যায় না। কাছাকাছি কোনও বাজারহাট তো নেইই। সেখানে দিব্যি নিজের বাড়ির মতো পাঁচফোড়নের ডাল ও পোস্তর তরকারী কোথা থেকে এল? ঐ মেয়ে দুটিই বা গভীর জঙ্গলে কোথা থেকে এসেছিল! প্রথমে তাঁর মনে কোনও ভাবনা জাগে নি। বাড়িতে এসে তিনি ঘটনাটি যতই ভাবেন ততই অবাক হন। আমার দিদিও গালে হাত দিয়ে থ' হয়ে গেলেন সব শুনে। দিদির বিশ্বাস গভীর বনে পরীরা এসে বিভূতিভূষণকে খাইয়ে গিয়ে ছিলেন। যে পরীদের কথা তাঁর আরক গল্পে আছে।

দুই বিড়ালী কথা

সুকুমার ভট্টাচার্য

ঘরের মধ্যে এসে—
বললে মাসী, জানিস পুষি,
মানুষ বড়ো বোকা,
নইলে কি আর পুষতো ঘরে
মৎস্য নামক পোকা!
আবার বলে অ্যাকুইরিয়াম,
মাছপোষা এক হবি,
এর থেকে যে অনেক ভাল
রঙীন মাছের ছবি।
সেটাও যেমন যায় না খাওয়া,
এটারও সেই দশা,
মিথ্যে আমার এই বাড়ীতে
মাছ মাংসের আশা।
খানিক পরে হেসে—
বললে পুষি,—বুঝলে মাসী,
তাইতো এ ঘর ছাড়ি,
গোঁসাই পাড়ায় ঠাঁই নিয়েছি
নিতু গয়লার বাড়ী।





মিরিক বেড়িয়ে এলাম

সুব্রত দে

ক'দিন আগে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মিত শৈলাবাস মিরিক ঘুরে এলাম। আমি এবং আমার বন্ধু তপু থাকি শিলিগুড়িতে, তাই ক্ষণিকের পরিকল্পনাতেই মিরিক ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলাম।

দিনটা মেঘলা মেঘলা থাকায় আমাদের কাছে ভ্রমণের প্রকৃষ্ট দিন হিসেবে বিবেচিত হোল। আমাদের ভ্রমণের পুঁজি অর্থাৎ টাকা-পয়সার বহরটা খুবই কম হওয়ায় বাড়ি থেকেই যৎসামান্য খাবার একটা 'এয়ার ইণ্ডিয়া' মার্কা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগে নিয়ে যথাসময়ে রওনা দিলাম। সঙ্গে একটা ক্যামেরা নেওয়ার প্রস্তাব উঠলেও হাল্কা পকেট অর্থাৎ ফিল্মের দামের কথা বিবেচনা করে বাদ দিতে হল।

যাই হোক 'অনিয়মের টাট্টু' হিসেবে পরিচিত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের একটা বাসে করে আমরা শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিলাম। অবশ্য বাসের অনিয়মের জন্য আমাদের কিছুই যায় আসে নি।

মাটীগাড়া পর্যন্ত শহুরে পরিবেশ থাকলেও অচিরেই আমরা দু'পাশের শালবনে ঢাকা রাস্তায় এসে পড়লাম। দু'পাশের শালবনের ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মাঝে মাঝে দেখতে অপূর্ব লাগছিল। ক্রমেই আমরা 'হিমুল মিল্ক বার' হয়ে বালাসন নদী পার হলাম।

আমাদের বাস মাঝে মাঝে বাইরে থেকে মনোযোগ টেনে নিচ্ছিল অসম্ভব ঝাঁকুনিতে। দু'পাশের চা বাগান মোহময় লাগছিল। মনে হচ্ছিল কোন আপন-ভোলা মালী নিপুণ হাতে ঘাসের কার্পেট তৈরি করেছে। সবুজ চা-বাগানের সমান আস্তরণের ওপর দিয়ে প্রাণ খুলে দৌড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

আমাদের বাস ক্রমান্বয়ে গাড়ীধোরা, দোধীয়া এবং আকর্ষণীয় গয়াবাড়ী চা-বাগান পার হয়ে বামনপুকুর এসে পৌঁছুল। বামনপুকুরের প্রধান আকর্ষণ সেগুন গাছ। বিস্তীর্ণ সেগুনের বন মন কেড়ে নেয়। ইতিমধ্যে সূর্য দেখা দেওয়ায় সেখানে সূর্য যেন লুকোচুরি খেলতে লাগল।

প্রায় দু'ঘণ্টা চলার পর আমরা মিরিক পৌঁছুলাম। সেখানে পৌঁছামাত্র আমরা যেন নতুন কিছু একটা আবিষ্কারের আনন্দ পেলাম। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। সব কিছুই এখানকার মন-ভোলানো, নয়ন-জুড়ানো।

মিরিক লেকের ধারের ক্রিপ্টোমেরিয়া গাছের সার, পাইন গাছের সবুজতা সব মিলিয়ে স্বপ্নপুরীর মতো মনে হয়। আমরা দুজনে' প্রথমে লেকের ধারে একটা পাইন গাছের নিচে বসে সঙ্গের পাঁউরুটী টোস্ট ও ডিমসেদ্ধ খেয়ে নিলাম। এরপর ডে-সেণ্টারের কোলাহলকে পেছনে রেখে লেকের ধার ধরে পাহাড়ের দিকে যেতে লাগলাম। জায়গাটা এমনই যে, মনে হচ্ছিল আমরা যেন গল্পে-পড়া কোনো রাজপুত্র হয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে উপত্যকায় এসে পড়লাম। ডেসেণ্টারের বেয়ারাদের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করার কারণ নেই বা বললাম।

এরপর ক্রমান্বয়ে আমাদের লেকের ওপর বোট চলাচল, বেশ ক'টা সরকারী বাংলো, সর্বোপরি চারপাশের কমলাবাগান। স্কোয়াসের ক্ষেত এবং এলাচ-বাগান দেখতে দেখতেই বেলা গড়িয়ে গেল।

লেকের ওপারে নিরিবিলি মতো জায়গায় একটা মন্দির আছে। সেখানে যাওয়ার জন্য লেকের ওপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা সেতু আসে। এই স্থান থেকে অস্তাচলগামী সূর্যকে অপূর্ব লাগছিল। ক্রমে আমাদের ফেরার সময় হয়ে এল।

শের বারের মতো তপু ও আমি মিরিকের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য চোখে ভরে নিয়ে শিলিগুড়িগামী বাসে চেপে বসলাম।

ক্যাঙারুর আত্মপ্রকাশ

নীল সেন

আজ দোলপূর্ণিমা বলে গঙ্গার ঘাটেতে বেশ মেলা বসেছে। আমাদের শৈলদাকেও দেখলাম লুচি বিক্রি করছে। কুমড়োর তরকারী আর রেপসিড তেলে ভাজা গরম লুচি। প্রতি পিস লুচির দাম মাত্র দশ পয়সা পুরো পঞ্চাশ পয়সার গরম লুচি খেয়ে খেয়ে ফেললাম।

এবার স্নান করতে হবে। আমরা মেলার মধ্যে দিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে এগুচ্ছি।—সামনেই গঙ্গা।

শৈলদার দোকান এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। মনে মনে ভাবছি গতকালের কথা। ক্যাবলা ক্যাঙারুর কথা।—না। সত্যি ক্যাঙারুটা বড্ডো বোকা। তা না হলে কাল চাঁচরের দিন শৈলদার সঙ্গে ঝগড়া করলো। আজ দোল। অথচ বেচারা শৈলদার দোকানে পর্যন্ত গেলো না আমাদের সঙ্গে গিয়ে ওকে আবির দিতে পারতো। পকেটে ওর যথেষ্ট পয়সাও ছিলো। কিন্তু তখনও দূরে একা একা রোদে দাঁড়িয়ে পাঁপর ভাজা কিনে খাচ্ছিলো।

গঙ্গার ধারে আজ ভিখারীদের মেলা। ওরা যে যার সামনে লম্বালম্বি একটা করে কাপড় বিছিয়ে বসে আছে। চালডালের সঙ্গে পয়সা চাইছে।

স্নান সেরে দল বেঁধে, ফেরবার পথে যুক্তি করলাম, আজ সিনেমা দেখবো সবাই। ম্যাটিনিশোতে নন্টুমামা আমার সঙ্গে টিকিট আনতে যাচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ীতে না যেতে পারলে আবার টিকিট পাওয়া যাবে না।

আমাদের এতো ইচ্ছা থাকা সত্বেও সিনেমা কারুরই দেখা হলো না। বাধ সাধলো ঐ ক্যাবলা ক্যাঙারুরই পিসি।

ভরদুপুরে জানলার রড ধরে বিকট চিৎকার।—ওরে আজ আমার কি সব্বোনাশ হলো রে। বোকা শোক-তাপ পাওয়া একরত্তির ছেলেটাকে আমার কে ভুলিয়ে নিয়ে গেলি রে। সব ছেলেরাইতো গঙ্গা থেকে বাড়ী ফিরলো। আমার ক্যাবোল যে আর ফিরলো না রে।

আমি ভয় পেয়ে, রান্নাঘরে ঢুকে মায়ের কাছে সত্যি কথা বলে ফেললাম।—ও আমাদের সঙ্গেইতো রঙ খেলতে বেরিয়েছিলো। গঙ্গার ধারেও গিয়েছিল।

মা সব শুনে আমাকে জোর ধমক দিলো। বললো চুপ কর হাঁদারাম। একদম চুপ। তোমার বাবুর কানে গেলে মার খাবে।

খাওয়া শেষ হলে, ফের বাড়ী থেকে বেরিয়ে দুপুর রোদে টো-টো করে ক্যাবলা ওরফে ক্যাঙারুকে খুব খুঁজলাম। কিন্তু ওর কোন পাত্তাই পেলাম না। আমি একা একা অনেকক্ষণ ধরে যখন ওর দেখা পেলাম না, তখন মনে মনে বেশ ভয় পেলাম। নন্টুমামা ততক্ষণে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে টিকিট কাটবো বলে আমাকে খুঁজছে।

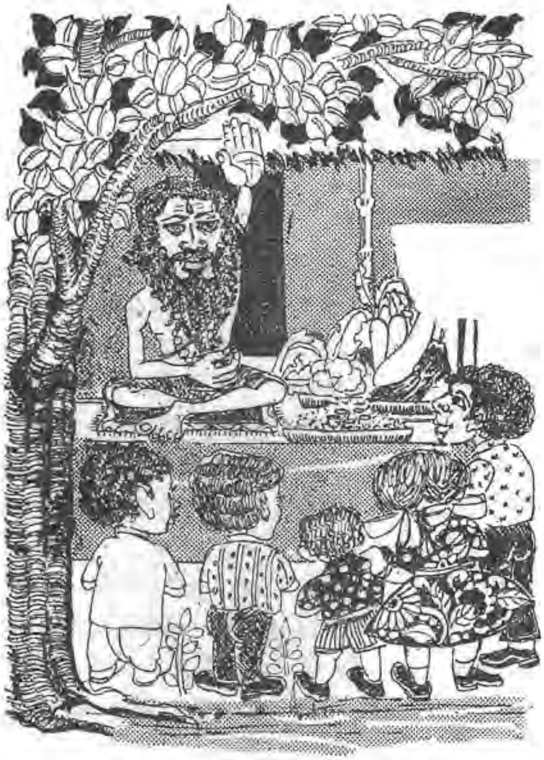
নন্টুমামাকে সব বললাম। এবং অদৃশ্য দেবতাদের ওপর আমি ক্যাবলাকে খোঁজবার ভার দিয়ে চলে গেলাম গঙ্গার ধারে। নন্টুমামাও আমার সঙ্গে এলো। ভিখারীদের ভীড় ঠেলে গিয়ে পোঁছলাম একেবারে গঙ্গার ধারে শেষ বটগাছের তলায়।

দেখলাম এখানে এক সাধুবাবাও এসেছে। ওর ঝুপড়ি ঘরের সামনে সাদা বাংলায় লেখা—মৌনীবাবা। ওর সামনে বেশ ভীড়।

আমরা দু'জনেই এগিয়ে গেলাম ওর সামনের দিকে। এখানে এসে ক্যাবলাকে খোঁজার কথাটা বিলকুল ভুলেই গেলাম।

এমন সাধুবাবা আমরা কোথাও দেখি নি। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের মতো হচ্ছেন মৌনীবাবা। ওর সামনে ডালমেশানো চাল। তার মধ্যে আবার একগাদা খুচরো পয়সা এবং সবুজ তরিতরকারীর আনাজ।

সাধুবাবা বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগের 'উর্দ্ধবাহু'



সাধুবাবা…'উর্ধ্ববাহু' হয়ে বসে।

হয়ে বসে। মাঝে মাঝে জটা আর কালো ঘন দাঁড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুখ খুলছে। কি ঝকঝকে হাসি।

শুনলাম সাধুবাবা নাকি তিব্বত পেরিয়ে নেপাল হয়ে এখানে এসেছে হেঁটে। এটা ওর গুরু সন্তুবাবা কাঁকিরামের আদেশ। কেবল পূর্ণিমার দিনই ওর দেখা মেলে, কথাও বলে। সাধারণ লোকেদের আসন্ন বিপদ থেকে 'সাওধান' করে।

এখানে সাধুর সামনেই বড় একটা লম্বা চিমটে। আর কাঠের পোড়া আগুন-ধোঁয়া। বাবা নাকি ভক্তদের কৃপাই করেন কেবল।

ভক্তদের দেওয়া কিছুই খান না। গঙ্গা দিয়ে রোজ 'ভোলাবাবা' শ্বেত ধুতরো ফুলের বিচি খোদ হিমালয় থেকে একটা করেই পাঠান। পরে সেই বিচি ভেঙ্গে ভাঙের সঙ্গে সরবৎ করে পেট ভরান মৌনীবাবা।

এইসব দেখেশুনে নণ্টুমামার মতো আমিও সাধু-বাবার এক নম্বর ভক্ত হয়ে পড়লাম।

নণ্টুমামা ফিসফিস করে বলে, যদি বাবাজী একবার বলে দেয়, কি করে ক্যাবলাটাকে পাওয়া যায়, অথবা পরীক্ষার খাতায় খুব কম লিখে বেশী নম্বর আসে; তবে বড়ো ভালো হয়।

আমিও মনে মনে ভাবছি কি করে আমার কথা বলবার সময় মুখের তোতলামি ভাবটা কমে, সে ব্যাপারে যদি এই বাবাজী কিছু সহজ পথ টথ বাতলে দেয়…।

ক্রমশঃ সূর্যটা হেলে পড়েছে পশ্চিমে।

আমি আর নাণ্টুমামা ওর সামনে জোড়হাত করে বসে আছি।

সারাদিনের পোড়া কাঠের আগুনের ধোঁয়াও প্রায় শেষ। চারিদিকে ফিকে হলুদ জ্যোৎস্না। জলেতে নৌকার ছায়া। আর ঝিঁঝিঁ পোকাদের একটানা সুরে কান্নার মতো থেকে থেকে রিক্সাওয়ালাদের —'হোলিহ্যায়' বলে কোরাস রামায়ণ গানের সঙ্গে কর্তালের শব্দটা ভেসে আসে।

মৌনীবাবা হয়তো আমার মনের কথাটা তখন বুঝতে পেরেছিলো। চোখ খুলে বললো—নীলু! দোস্ত মিল যায়গা। ঘাবড়াও মৎ। বলে ফিক্ করে হাসলো।

আমি মনে মনে ঐ সাধুবাবার হাঁসি দেখে বুঝলাম নিশ্চয়ই মৌনীবাবার একথাটা মিথ্যা হবে না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো-ঐ হাসিটা ঠিক কার মতো যেন, খুব চেনাচেনা লাগছে। বাইরে বেরিয়ে নণ্টু-মামাকে চুপিচুপি ঐ-কথাটা বলতেই নণ্টুমামা হেসে বললো, দূর বোকা, সাধুদের হাসি তো খুবই পবিত্র। তাই ঐ রকম সব মহাপুরুষদের হাসিগুলোকে চেনাচেনা বলেই মনে হয়। বুঝলি না ?

আমি বোকার মতো ঘাড়নেড়ে বললাম, তা-তা-বটে।

পরদিন।

সকাল হতে না হতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেলো। আমাদের ক্যাবলা ওরফে ক্যাঙারু স্বয়ং স্ব-শরীরে ওর পিসির সঙ্গেই আসছে। পিসির এক-হাতে গঙ্গাজলের ঘটি। অন্য হাতে ক্যাবলা।

পিসি ওকে নৌকোর গুণ টানার মতন টানতে টানতে হিড় হিড় করে ঢুকছে পাড়ায়।

পিসি আমার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকে—নীলে! এই নীলে!

সকালবেলা, খালি গায়ে ঠক্ ঠক্ করে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে ক্যাবলা ওরফে ক্যাঙারু। আমার আগেই পিসির চিৎকারে মা ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। মাকে দেখে ওর পিসির চিৎকার বেড়ে যায়। যার অর্থ হলো, ওরে! আমার কি সব্বোনাশ হচ্ছিলোরে। একরত্তি ছেলে। আমার সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছিলো। হায়! হায়! যদি আজ দিদি সকাল করে গঙ্গায় না যেতাম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম সদরের দিকে। ক্যাবলার পিসি ততক্ষণে ওদের সদর দরজার মধ্যে ক্যাবলাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে, দরজাটা গার্ড করে দাঁড়িয়েছে। চেহারাটাকে দেখে আমার মনে হলো পিসি যেন ওকে মিলিটারীদের কায়দায় পাহারা দিচ্ছে।

আমি খুব ভালোমানুষের মতো গদ্‌গদ হয়ে ভয়-পাওয়া গলায় বললাম—পিসিমা। ক্যাবলার সঙ্গে আমি একটু দেখা করবো। সত্যি তুমি না গেলে ওকে আর পাওয়াই যেতো না।

দেখলাম কথাটা ওর পিসির কানে ঢুকতে না ঢুকতেই হাতে হাতেই তার ফল মিললো। পিসির সব রাগ যেন জল হয়ে গেলো। জানালার আধ-ভেজানো পাল্লাটা দিয়ে, ক্যাবলা একাদশীর চাঁদের মতো মুখ বাড়িয়ে একটু হাসলো।

আমি আবার একটু সাহস করে বললাম, পিসিমা, ভাগ্যিস তুমি ছিলে।

ওর পিসিমা অমনি কোন কথা না বলে, আমার লম্বা রোগা বকের মতো গলাটাকে ধরে সদর দরজার মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিলো।

তারপর পিসি সদর দরজাটাতে দড়াম করে খিল দিয়ে বললো—শোন্ নীলে (আমাকে ওর পিসি আদর করে নীলে বলে ডাকে), তুই একদম বকাটে বুড়ো শৈল-টৈলদের সঙ্গে মিশবি নি বলে দিলাম। ও ক্যাবলাকে আমার সাধু করবার মতলব করেছিলো। পারলো না। এখন তুই বস্ হতভাগা। আমি আবার জপ-আহ্নিকটা সেরে আসি। যেন পাইলে যেও না।

আমার উদ্দেশ্য যে এখন পালাবার নয়। ক্যাবলাকে উদ্ধার করাই উদ্দেশ্য। পিসি ততক্ষণে গঙ্গার ঘোলাজল পেতলের ঘটিটা থেকে বার করে আমাদের মাথায় দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলো। ক্যাবলা ক্যাঙারু ততক্ষণে ড্রেস চেঞ্জ করতে দোতলায় গেছে।

দেখলাম দূর থেকে শৈলদার সঙ্গে নণ্টুমামাও ফের এদিকেই আসছে।

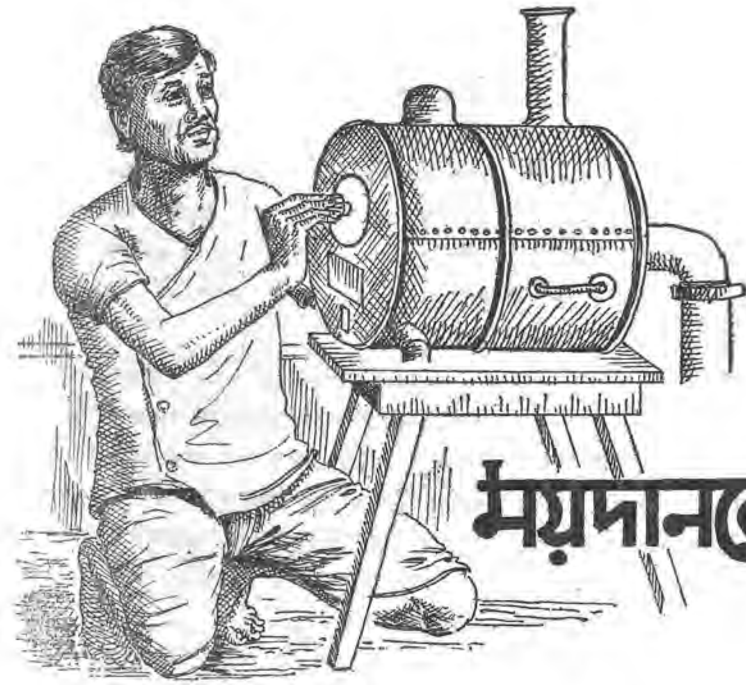
ক্যাবলা আমার কাছে এসে হেসে বললো, কিরে নীলু কাল যাত্রা পার্টির অধিকারী পাঁচুদাকে কেমন ঠকিয়েছিলাম বল্? আমি ওর দিকে তাকিয়ে শুধু একটু বোকার মত হাসলাম। সত্যি, আমিও তো কাল ওকে চিনতে পারি নি!

"অলিম্পিকে স্বর্ণজয়"

রূপক চট্টোরাজ

হকি খেলায় মস্কো মেলায়
সবারে করে কাত
ভাঙ্গা আসর জমিয়ে 'ভারত'
করলো বাজীমাৎ।
সোনার পদক ঝুলিয়ে গলায়
আসছে ফিরে ঘরে,

অলিম্পিকে হকির সেরা
ষোলটি বছর পরে।
কেউ নাচে গায়, কেউ বা চেঁচায়
মুখর চারিদিক
বিশ্বব্যাপী নাম ছড়ালো
মস্কো অলিম্পিক।।



ময়দানবের কল

সিদ্ধার্থ ঘোষ

দানবরা কিন্তু সবাই খারাপ লোক নয়। চেহারাটা হয়তো তাদের বড়-সড়, গায়ের জোরটাও একটু বেশী —কিন্তু তার জন্যে কি কাউকে খারাপ বলা উচিত? এই যে ময়দানব, রামায়ণ ও মহাভারতের ইঞ্জিনীয়ার, লোকটা মোটেই খারাপ ছিল না। যে-গদার জন্য ভীম-এর অত লম্ফঝম্প সেতো ময়দানবই দিয়েছিল। অর্জুনও দেবদত্ত শঙ্খটিকে ময়দানবের সৌজন্যেই লাভ করেছিল। আর যুধিষ্ঠির? যুধিষ্ঠির তো বলবে, হ্যাট্‌স্ অফ। ময়দানব বিনা তাঁর ওই গর্বের রত্নময়ী সভা তৈরী হত কোনদিন। কিন্তু দুঃখের কথা পৌরাণিক যুগের পরে কেউ আর ময়দানবের কীর্তির কথা তেমন খেয়ালে রাখে নি। আজ যেমন কেউ বলে না, আমার ছেলে সাহিত্যিক হবে, তেমনি শ' খানেক বছর আগেও কেউ চাইত না তার ছেলে ময়দানব হোক, কলকব্জা বানাক। তা না হলে আর সোনার ভারতের অমন দশা হয়। ফিরিঙ্গি সাহেবরাও তো সেই সুযোগ নিয়েছিল। নিজেদের দেশে কলকব্জা বসিয়ে কলে তৈরী জিনিস সস্তা দরে বেচে আমাদের দফা রফা করে ছেড়ে দিয়েছিল। এতদিনে আবার আমরা ভুল শুধরোতে শুরু করেছি। তা বলে আমাদের দেশের মানুষ যে কলকব্জা একেবারেই বানায় নি তা নয়। আজ তোমাদের এই রকম একজনের কথাই বলব। নাম তার গোলোকচন্দ্র। বাঙালী ছেলে। দেড় শো বছরের আগে সে এমন এক কল বানিয়েছিল যে ফিরিঙ্গি সাহেবরাও তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে, গোলোকচন্দ্র আধুনিক কালের ময়দানব, ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার।

গোলোকচন্দ্রের কথা বলার আগে কেরী সাহেবের কথা বলে নিতে হবে। উইলিয়াম কেরীর নাম হয়তো তোমরা শুনেছ। কেরী সাহেব ভারতে এসেছিলেন মিশনারী হিসাবে। মানে, কালো মুখ্যু মানুষগুলোকে প্রভু যিশুর হাতে তুলে দেবার জন্য। কিন্তু বাঙলার জল-মাটি ও মানুষদের তিনি বড় ভালবেসে ফেললেন। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে তিনি প্রচার করলেন

বাংলা ভাষা। তৈরি করলেন বাংলা ভাষায় বই ছাপার কারখানা। বই ছাপতে লাগে হরফ, কাগজ ও ছাপার মেশিন। কোনটাই তখন ছিল না। কেরী সাহেব হরফ গড়ালেন। কাগজ তৈরি করার কল বসালেন। ছাপাখানা বসালেন। বাংলা হরফ তৈরি করে অমর হয়ে রইলেন পঞ্চানন ও মনোহর কর্মকার। কেরী সাহেবের কর্মক্ষেত্র ছিল শ্রীরামপুর। সে-সময়কার শ্রীরামপুরের কথা লিখেছেন দীনবন্ধু মিত্র।

'সর্ব্ব অগ্রে ছাপাখানা এই স্থলে হয়
মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গ-গ্রন্থচয়।
কাগজের কল হেথা অতি চমৎকার
জন্মিছে কাগজ তায় বিবিধ প্রকার।'

এই চমৎকার কাগজের কলেই চাকরি করতেন গোলোকচন্দ্র। পেশায় তিনি কামার। ১৮২০ সালের ২৭ শে মার্চ কেরী সাহেব ইংল্যান্ড থেকে একটি বাষ্পের ইঞ্জিন আনিয়ে এই কাগজের কল চালাতে শুরু করেন। তখন অবধি ভারতে এইরকম ধোঁয়া-ছাড়া চাকা-ঘোরানো দানবরা আসে নি বললেই চলে। চুল্লীতে গনগন করে আগুন জ্বলছে, জল ফুটে বাষ্প হচ্ছে আর সেই বাষ্পের চাপে কলের চাকা ঘুরছে বনবন করে—এই দৃশ্য দেখবার জন্যে দলে দলে লোকে আসত শ্রীরামপুরে। তারা এটিকে বলত 'আগুনের কল'। গোলোকচন্দ্র কিন্তু আর পাঁচজনের মতো শুধু অবাকই হন নি, তিনি যে জাত-ময়দানব। তিনি ইঞ্জিনটি খুব ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখে নিজেই হাত লাগালেন আরেকটি 'আগুনের কল' তৈরি করবেন বলে। একদিন সত্যি সত্যিই তাঁর 'আগুনের কল' তৈরি হল। কেরী সাহেবকে ডেকে এনে তিনি দেখিয়েও দিলেন। কলটা আকারে অনেক ছোট হলেও তেজ তার কম ছিল না। পাম্প চালিয়ে দিব্যি জল তুলত। কেরী সাহেব গোলোকচন্দ্রের এই কৃতিত্বে খুবই খুশী হয়ে উঠলেন। ১৮২৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে 'এগ্রি-হর্টি কালচারাল সোসাইটি'র দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীর সময় গোলোকচন্দ্র তাঁর ইঞ্জিনটি দিয়ে পাম্প চালিয়ে ও জল তুলে সবাইকে চমকে দিয়ে প্রথম পুরস্কারের নগদ প-ঞ্চা-শ টাকা লাভ করেন। গোলোকচন্দ্রই প্রথম ভারতীয় যিনি বাষ্পের ইঞ্জিন তৈরি করেছেন। তাই প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারের মুকুটটিও তাঁরই প্রাপ্য।

আলো জ্বালাও

করুণাময় বসু

দুলিয়ে মাথা বলছে হেঁকে
দীনবন্ধু মাস্টার,
শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিতে
কম করিস্‌নে চেষ্টার।
বলছি রে, ভাই, জ্বালাও আলো,
আর রেখেনো বন্ধ দ্বার,
জ্ঞানের আলো জ্বাললে তবে
ঘুচবে সবার দুঃখভার
হঠাৎ ঘরে নিভলো বাতি,
লোডশেডিঙের অন্ধকার।



মাত্র কয়েকদিন হল সুরেনবাবু কোলকাতার অফিসে বদলি হয়ে এসেছেন। কোলকাতার এই অঞ্চলটা তাঁর কাছে বড় নির্জন মনে হয়। এই সল্টলেক জায়গাটা কোলকাতার মধ্যে হলেও সুরেনবাবুর কিন্তু জায়গাটাকে কোলকাতা বলে মনেই হয় না। যেন একটা বিস্তীর্ণ মরুভূমি। আশেপাশে বাড়িঘর দু' একটা যা আছে তা অনেক দূরে দূরে। লোকজন খুবই কম। পুরোনো পরিবেশ ছেড়ে এখানে এসে সুরেনবাবুর একটুও ভাল লাগে না।

এখানে এসে জয়েন করার মাত্র তিন-চার দিন পরেই সুরেনবাবুর নাইট ডিউটি শুরু হল। একে এই নির্জন জায়গা, তার ওপর আবার এখানে রাত কাটানো, ভাবতেই কেমন অস্বস্তি বোধ হল তাঁর। কিন্তু কি করা যায়? চাকরির খাতিরে থাকতেই হবে। প্রথম দিন নাইট-ডিউটিতে এসে পরিচয় হল মিত্রবাবুর সঙ্গে। মিত্রবাবু তাঁর দুটো ঘর পরেই বসেন। উনি এখানকার পুরোনো লোক। এখানকার সব কিছু তাঁর নখদর্পণে বেশ হাসিখুশি জমাটি লোক। সুরেনবাবু এই রকমই একজনকে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বেশ জমে গেলেন মিত্রবাবুর সঙ্গে। প্রায় ঘণ্টাখানেক প্রাণ খুলে গল্প করলেন ও'রা। তারপর রাত প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ মিত্রবাবু বললেন, "এবার চলি সুরেনবাবু, হাতে অনেক কাজ আছে, আপনিও কাজ করুন, পরে আসব। আপনার টেবিলের ড্রয়ারে মোমবাতি আর দেশলাই আছে, লোডশেডিং হলে জেবলে নেবেন, চললাম।" বলে তিনি তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

তারপর ঠিক রাত দশটায় আলো গেল নিভে—লোডশেডিং। সুরেনবাবু তাড়তাড়ি মোমবাতিটা জেবলে নিলেন। হাতের কাছে কাজ আছে অনেক, কিন্তু মন বসছে না কিছুতেই; তার ওপর আবার এই লোডশেডিং। মোমবাতির টিমটিমে আলোয় কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ তাঁর মনে হল যেন সারা ঘরটায় একটা হিমশীতল বাতাস বয়ে গেল মুহূর্তে। সেই বাতাসে মোমবাতির শিখাটাও যেন

একবার কেঁপে উঠল বলে মনে হল। কিন্তু এ ঘরে হঠাৎ বাতাস আসবে কোথা থেকে ? এ ঘরে কোথাও এতটুকু ফাঁক-ফোকর আছে বলেও তো মনে হয় না। দিনের বেলায়ও এসব ঘরে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। সারা দিনরাতই বলতে গেলে এখানে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। বাইরে প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি বজ্রপাত হলেও এ ঘরে বসে টের পাবার উপায় নেই। তাহলে এই বাতাস এলো কি করে ? তবে কি এটা সুরেনবাবুর মনের ভুল ? হতেও পারে।

এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সুরেনবাবু দেখলেন, তাঁর ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। উনি কিছুটা চমকে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, "কে, কে ওখানে ?"

সঙ্গে সঙ্গে দরজার ফাঁক দিয়ে একটা মুখ দেখা গেল। আবছা আলোয় তার মুখটা পরিস্কার বোঝা গেল না। সে শুধু মুখটুকু বাড়িয়েই অদ্ভুত এক দৃষ্টি মেলে বলল, "আমি স্যার, আমি অনাদিপ্রসাদ।"

মানুষ দেখে সুরেনবাবু যেন কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। এবার তাই চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন।"

অনাদিপ্রসাদ এবার আস্তে আস্তে দরজাটা ঠেলে ভেতরে এল। সে ভেতরে ঢুকতেই সুরেনবাবু যেন অদ্ভুত একটা গন্ধ পেলেন যাকে। গন্ধটা ঠিক সুগন্ধি জর্দার মত। অনাদিপ্রসাদ বিনয়ের সুরে বলল, "আমাকে আপনি বলবেন না স্যার, আমি এখানে পিওনের কাজ করি।"

অনাদিপ্রসাদকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করলেন সুরেনবাবু। কিন্তু লোকটার মুখের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। অনাদিপ্রসাদের বাঁ চোখটা এতই ছোট যে মোমবাতির আলোয় তার মুখটা কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়লে আতঙ্ক জাগবেই। তার দৃষ্টিটা যেন কেমন অস্বাভাবিক স্থির। মনে হল তার চোখের পাতা পড়ছে না। সুরেনবাবু বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। শুধু চেহারাটা ভাল করে আর একবার লক্ষ্য করলেন। ছোটখাট কর্মঠ চেহারা, পরনে একটা খাটো মাপের ময়লা ধুতি, গায়ে নীল রঙের ঢোলা জামা, কাঁধে একটা ময়লা টাওয়েল। সারা শরীরে দারিদ্র্যের ছাপ খুব স্পষ্ট।

সুরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার, কি চাই তোমার ?" বলে সুরেনবাবু মনে মনে ভাবলেন, অনাদিপ্রসাদেরও কি রাত্রে ডিউটি থাকে ? কিন্তু মুখে তিনি কিছু প্রকাশ করলেন না।

অনাদিপ্রসাদ আমতা আমতা করে বলল, "না স্যার, চাই না কিছু, আপনি কি চা খাবেন ?"

সুরেনবাবু বিস্ময়ের সুরে বললেন, "এত রাতে তুমি এখানে চা কোথায় পাবে ?"

অনাদিপ্রসাদ রহস্যের সুরে বলল, "সে আমি ঠিক আনব, আপনি খাবেন কিনা তাই বলুন।"

সুরেনবাবু তাঁর ব্যাগ থেকে একটা টাকা বার করে বললেন, "বেশ, যদি পারো, তো নিয়ে এস, এই নাও, টাকা নিয়ে যাও।"

অনাদিপ্রসাদ অমনি এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর বাঁ হাতটা রেখে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল টাকাটা নেবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে টেবিলের জ্বলন্ত মোমবাতিটা গেল দপ্ করে নিভে। কি করে যে মোমবাতিটা নিভে গেল, সুরেনবাবু কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। ঘরের মধ্যে তো এতটুকু হাওয়া নেই, তাহলে নিভল কি করে ? তিনি কিংবা অনাদিপ্রসাদ ফুঁ-ও তো দেন নি। সুরেনবাবু কেমন যেন হতভম্ব বনে গেলেন। কি যে করবেন কিছুই ভেবে পেলেন না। অন্ধকারে শুধু এদিক ওদিক হাতড়াতে লাগলেন দেশলাইটার জন্যে। অনাদিপ্রসাদকে শুধু একবার বললেন, "দাঁড়াও অনাদিপ্রসাদ, আমি মোমবাতিটা জেবলে নিই। কি করে যে নিভল মোমবাতিটা কে জানে !"

কিন্তু দেশলাইটা খুঁজে পাওয়ার আগেই মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মোমবাতিটা আবার আপনিই জ্বলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরেনবাবু তাকিয়ে দেখলেন, অনাদিপ্রসাদ ঘরে নেই। কিন্তু এতটুকু সময়ের মধ্যে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কি করে ? সুরেনবাবুর হাতে টাকাটাও নেই। অনাদিপ্রসাদ তাঁর হাত থেকে টাকাটাই বা নিল কখন ? লোকটা কি জাদু জানে ? সুরেনবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে লোকটা নিশ্চই জাদু দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রথম দিনেই একটু মজা করতে চায়। তিনি মনে মনে ভাবলেন, চা নিয়ে তো লোকটা এক্ষুণি আসবে, তখন যদি আবার জাদু দেখাতে যায়, ঠিক ধরে ফেলবেন।

ভাবতে ভাবতেই মাত্র কয়েক মিনিট পরেই সুরেনবাবুর যেন মনে হল, সেই হিমশীতল বাতাসটা আবার তিনি অনুভব করছেন। আশ্চর্য! ক্রমশঃ সমস্ত পরিবেশটাই যেন কেমন থমথমে হয়ে এল। পরক্ষণেই ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে ঠেলে রহস্যজনক ভাবে অনাদিপ্রসাদ এসে ঘরে ঢুকল আবার। হাতে তার চায়ের গ্লাস, ঠোঁটে মুচকি মুচকি হাসি। সঙ্গে সঙ্গে সেই সুগন্ধি জর্দার গন্ধটাও নাকে এলো সুরেনবাবুর। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না ঐ হিমশীতল বাতাস আর এই গন্ধটা কোথা থেকে আসছে। অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে সুরেনবাবু বললেন, "কি ব্যাপার অনাদিপ্রসাদ, তুমি কখন টাকাটা নিয়ে চলে গেলে বলতো? আর মোমবাতিটাই বা অমন নিভে গিয়েই আবার জ্বলে উঠল কি করে? তুমি কি ম্যাজিক-ট্যাজিক জানো নাকি?"

অনাদিপ্রসাদ একই ভাবে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে চায়ের গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখতেই আগের মতো মোমবাতিটা আবার দপ্ করে নিভে গেল। এবার সুরেনবাবু রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত সুরে বলে উঠলেন, "একি অনাদিপ্রসাদ, আবার তুমি বাতিটা নিভিয়ে দিলে!" বলতে বলতেই মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে মোমবাতিটা আবার জ্বলে উঠল। সুরেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে তাকালেন সামনের দিকে, কিন্তু অনাদিপ্রসাদে নেই। চায়ের গ্লাসটা কিন্তু বসানো রয়েছে টেবিলের ওপর আর সেই টাকাটাও পড়ে রয়েছে পাশে। ঘরের চারদিকটা একবার ভাল করে লক্ষ্য করলেন তিনি, কিন্তু অনাদিপ্রসাদের টিকির পাত্তা নেই কোথাও। এতক্ষণে সুরেনবাবুর পা দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে। উনি টেবিল ছেড়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। তারপর উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন, "অনাদিপ্রসাদ! অনাদিপ্রসাদ—!"

সুরেনবাবুর গলার আওয়াজ পেয়ে পাশের ঘর থেকে মিত্তিরবাবু ছুটে এসে বললেন, "কি ব্যাপার, অমন চিৎকার করে কাকে ডাকছেন?"

সুরেনবাবু কাঁপা গলায় বল্লেন, "অনাদিপ্রসাদ চা দিয়ে কোথায় চলে গেল বলুন তো?"

মিত্তিরবাবু বিস্ময়ের সুরে বললেন, "কি বলছেন মশাই, আপনি কাকে খুঁজছেন?"

সুরেনবাবু একই সুরে বললেন, "অনাদিপ্রসাদকে, আমাদের পিওন অনাদিপ্রসাদকে।"

সুরেনবাবুর মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে মিত্তিরবাবু বললেন, "কি যে বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি কি পাগল-টাগল হয়ে গেলেন নাকি? অনাদিপ্রসাদকে আপনি কোথায় পেলেন এখানে?"

সুরেনবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "কেন, সে তো এইমাত্র আমাকে চা দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। চলুন, দেখবেন চলুন, এখনো চায়ের গ্লাসটা আমার টেবিলের ওপর রয়েছে।"

মিত্তিরবাবু আরও বেশী অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "কই, চলুন তো দেখি।" বলে তিনি সুরেনবাবুর ঘরে এসে দেখলেন, সত্যিই চা-সমেত গ্লাসটা তখনো টেবিলের ওপর বসানো রয়েছে। মিত্তিরবাবুর নিজেরই সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা জানতে চাইলে সুরেনবাবু আদ্যপান্তো সবটা বলে গেলেন মিত্তিরবাবুর কাছে। সব শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তিনি। তবুও সবটার মধ্যে একটা রহস্য থেকেই গেল। তিনি এবার সুরেনবাবুকে বললেন, "দেখুন সুরেনবাবু, আপনি ভুল দেখেছেন, কারণ অনাদিপ্রসাদ আজ বছর খানেক হল মারা গেছে! সে আমাদের অফিসেরই পিওন ছিল। একদিন এই ঘরেই সে হীটার জেবলে চা করতে গিয়ে কারেন্ট লেগে মারা যায়। অতএব আপনি যে অনাদিপ্রসাদকে দেখেছেন সে সত্যি অনাদিপ্রসাদ নয়। এ অফিসের অনেকেই নাকি তাকে এমন দেখেছে। তবে আমি কখনো দেখি নি তাকে। বড় ভাল লোক ছিল। অফিসে সকলের মায়া আজও কাটাতে পারে নি বলেই হয়ত বার বার তার আত্মা এখানে আসে। তবে কারোর কোন ক্ষতি সে করে না।"

সুরেনবাবু এবার জড়ানো স্বরে বললেন, "আচ্ছা, অনাদিপ্রসাদ কি জর্দা খেতো?"

মিত্তিরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেন বলুন তো?"

সুরেনবাবু বললেন, "অনাদিপ্রসাদ দুবার আমার কাছে এসেছে, দুবারই আমি অপূর্ব জর্দার গন্ধ পেয়েছি।"

মিত্তিরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, অনাদিপ্রসাদ পানের সঙ্গে সুগন্ধি জর্দা খেতো, ওটাই ছিল ওর একমাত্র নেশা।"

মিত্তিরবাবুর কথাগুলো শুনতে শুনতে সুরেনবাবুর বুকের রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগল।

পশু হলেও সে মা

সৌরেন্দ্র কুমার পাল

আফ্রিকায় কেনিয়ার জঙ্গলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক গেম ওয়ার্ডেন বা ফরেস্ট অফিসারের কাজ করতেন। সেই জঙ্গলে নানা জাতের বন্য প্রাণী ছিল। সিংহ, চিতাবাঘ, হাতী, গণ্ডার, জিরাফ, জেব্রা, নু, নানান জাতের হরিণ, ভীষণাকৃতি ওয়াট নামক বন্য বরাহ এবং আরো কত রকমের পশু পাখি।

ওয়ার্ডেন সাহেবের কাজ ছিল খুবই দায়িত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক। জঙ্গলে নানা রকম কাজ হয়, সেই সব কাজ তদারক করা, জঙ্গলে চোরা শিকারী যাতে লুকিয়ে কোন জন্তু জানোয়ার না মারতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং বেআইনী ভাবে যাতে কেউ জঙ্গলের কাঠ কেটে না নেয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি। এ ছাড়াও লক্ষ্য রাখতে হয় বন্য প্রাণীরা যাতে রোগাক্রান্ত না হয় তা ব্যবস্থা করা। যদি দেখা যায় কোন বন্য পশু অসুস্থ হয়েছে, তবে তাকে ধরে এনে চিকিৎসা করার দায়িত্ব ওয়ার্ডেনের। এই সব কাজ করতে গিয়ে সিংহ হাতি গণ্ডার এর মত বড় বড় জন্তুদের তাড়া খাওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং এতে কোন বিপদ ঘটা আশ্চর্যের নয়।

সুতরাং, এই সব চাকরি করতে হলে জঙ্গলের মধ্যে বাস করতেই হবে। সেখানে লোকালয় নেই, সিনেমা থিয়েটার বা ফুটবল ক্রিকেট খেলা বা দেখার কোন সুযোগ নেই। আছে শুধু আদিম অরণ্য আর অরণ্যচারীরা, আর আছে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য বিভিন্ন ঋতুতে যার বিভিন্ন রূপে প্রকাশ।

ওয়ার্ডেন সাহেবের কোয়ার্টারটি ছিল সুন্দর এক পরিবেশে। কাছাকাছি ছিল একটি নদী আর ছিল ছোট জাতের গাছের হাল্কা জঙ্গল। কোয়ার্টারের আঙিনা ছিল অনেকটা জমি নিয়ে। সেখানে নানা রকম ফুল ফলের গাছ, আর একদিকে ছিল ছোট্ট চিড়িয়াখানার মতন। জঙ্গলে ঘুরতে যে সব জন্তু জানোয়ারের শিশু সন্তানদের নিঃসহায় একলা অবস্থায় পেতেন, সাহেব তাদের ধরে নিয়ে আসতেন ঘরে। তারপর বড় হলে আবার তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসতেন স্বাধীন জীবন যাপন করতে।

নদীতে প্রায়ই দেখা যেত বুনো হাতীর দল মহা আনন্দে স্নান করছে। তাদের সোরগোলে তখন কান পাতা দায় হোত। প্রতি রাত্রে শোনা যেত সিংহের গর্জন কাছে বা দূরে। এই রকম পরিবেশে ওয়ার্ডেন সাহেব তার স্ত্রী এবং শিশু সন্তান নিয়ে বাস করতেন। মেমসাহেব প্রত্যহ ছোট্ট মেয়েটিকে পেরামবুলেটারে বসিয়ে বিকেলে কাছাকাছি খোলা মাঠের দিকে বেড়িয়ে নিয়ে আসত।

একদিন বিকেলে আট-ন মাসের মেয়েকে পেরামবুলেটারে নিয়ে রোজকার মত বেড়াতে বেরিয়েছে। সেই মাঠের অদূরে জঙ্গলের গাছ গাছড়া। মেমসাহেব

জঙ্গল থেকে বেশ কিছুটা তফাতে মাঠ একটু সমান জায়গায় রোজ বসত। সেদিনও তাই করল এবং কী মনে করে মেয়েকে গাড়ী থেকে তুলে মাটিতে বসিয়ে দিল। মেয়েটির কি আনন্দ! সে দুহাত তুলে নানা শব্দ করতে লাগল, যেন মাকে তার আনন্দের কথা বলছে; আর মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিচ্ছে। কালা আদমির দেশ আফ্রিকার বুকে যেন সে মাটির স্বাদ অনুভব করে খুব খুশী, মাও খুব খুসি সন্তানের আনন্দ দেখে।

হঠাৎ মেমসাহেবের নজরে পড়ল একটি সিংহী কখন নিঃশব্দে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় বিশ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে তার তিনটি শাবক। সিংহী দেখছে মেমসাহেবকে, আর মেমসাহেব ভয়ে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে সিংহশিশুদের মায়ের দিকে। সিংহী দু চার পা এগিয়ে আসতে মেমসাহেব তাড়াতাড়ি তার মেয়েকে তুলে গাড়ীতে বসাল কিন্তু এক পাও এগিয়ে বা পিছিয়ে যেতে সাহস পেল না, উপায় না দেখে মেমসাহেব গাড়ীর হাতল ধরে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

ওদিকে সিংহীর বাচ্চা তিনটি আনন্দে খেলতে খেলতে মার সঙ্গে এগিয়ে আসছে। মেমসাহেবের কচি মেয়েটি ওদের দেখে আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। এই রকম সংকটময় অবস্থায় মেমসাহেব উপস্থিত বুদ্ধি না হারিয়ে সিংহীর মনোভাব বুঝবার জন্য নিশ্চল হয়ে দেখতে লাগল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সিংহী পেরামবুলেটারের ঠিক পাশে এসে দাঁড়াল, আর অমনি মেয়েটি হাত বাড়াল সিংহীর দিকে। সিংহীর একটি বাচ্চা তখন পেরামবুলেটারের চাকা কামড়াচ্ছে, আর একটি মেম সাহেবের পা আঁকড়ে ধরেছে খেলার ছলে। মেয়ের বিপদ আশঙ্কায় মায়ের বুক তখন ভয়ে দুরু দুরু। কি জানি কখন কী হয়। নিজের পায়ে যে সিংহ-শিশু পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে সে জন্য তার ভ্রূক্ষেপ নেই অসীম মনোবলে তার এসব সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

এমনই এক চরম অবস্থা অল্পক্ষণ চলার পর সিংহী মেম সাহেবের দিকে মুখ তুলে দেখল, তারপর শান্ত অথচ মন্থর গতিতে যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে চলতে লাগল। বাচ্চা তিনটেকে সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে ঢোকবার আগে সিংহী আর একবার পিছন ফিরে মেমসাহেব এবং তার মেয়ের দিকে দেখল। দুটি বিনিময় হোল দুই মায়ের, আর ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি পেরামবুলেটারে বসে হাত নাড়ছে, সিংহীর বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে যেন বলছে, বাই-বাই, টা-টা!

সিংহী পশু হলেও সে মা, তাই বোধ হয় সে বুঝেছিল, মেমসাহেবটি তার ভক্ষ্য হলেও সেও ওই ছোট্ট সন্তানের মা।

পশুর ও যে মাতৃত্ববোধ আছে এই সত্য ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় নাকি?



মেয়েটি পেরামবুলেটারে বসে হাত নাড়ছে



ভূত-পেত্নী কোথায় নেই

নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চমকানোর কিছু নেই। জেনে রাখা ভাল যে ভূত আছে, এবং খালি চোখে দেখাও যায়। তবে তার জন্য অনেক সময় নিজেদের বাড়ি, শহর বা গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়তেও রাজী থাকা চাই। একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সাহসী হতে হয় খুব বেশী। শহরে বা গ্রামে ভূত নেই বলছি না। আছে। শহরে কম আছে। গা ঘোলানো ভিড়ের ভিতরে ভূতরা আজকাল থাকতে চাইছে না। ভিড় তাদের বড় অপছন্দ। আলো-ঝল-মল রাত্রিও তাদের পছন্দ না। এই অসুবিধাটা ভূতদের আজকাল দূরে হয়েছে লোডশেডিং এর জন্য। আসল অসুবিধা হল অনেক মানুষের ভিড়ে ভূত যদি দেখাও যায়, তাদের চেনা বড় শক্ত। কি চেহারায়, কি চাল-চলনে মানুষের সঙ্গে এত বেশী মিল যে আলাদা করে চেনা মুশকিল। এ সমস্যা গ্রামেরও। আমার কথা, গ্রামের দিকে এখনো দু-চার জনকে মাঝে মধ্যে ভূতে ধরছে। ভূত ছাড়ানো ওঝারাও বেঁচে-বর্তে আছে। শহরে তো ওপাট উঠে যেতে বসেছে। ভূত না থাকলে ওঝার কি দরকার। তারা চাকরি খুঁজতে লেগেছে। কেউ কেউ চাকরি পেয়েও গেছে। এখন শহরে ন মাসে, ছ-মাসে কাউকে যদি ভূতে ধরেও, ওঝা নেই। গ্রাম থেকে যায়। গ্রামে ভূত থাকার কারণ হচ্ছে এখানে রাত্রি কালো। শহরের সঙ্গে তুলনাই হয় না। গা-ছম-ছম করা অন্ধকার খুঁজতে হয় না। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। তাই বলে আমি ভূত দেখতে চাই বললেই ভূতরা অমনি সবাই হুড়-মুড় করে গাব গাছ, বট গাছ থেকে কি পেত্নীরা গাছ থেকে নেমে আমার সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, এমন হতেই পারে না। ভূত-পেত্নীদের আমাকে দেখা দেওয়ার এত গরজ নেই। সবার নেই। কারো কারো থাকেও। তাদেরই শুধু দেখা যায়। তাদের সংখ্যা খুব কম। এই জন্যই বেশির ভাগ লোকই সারা জীবনে একবারও

ভূত দেখে নি। তারা ভূতের গল্প শোনে। কেউ কেউ বিশ্বাসও করে, ভূত আছে। এদের ভেতরে দু-এক জনকে আপসোস করতে শুনেছি—নাঃ। ভূত দেখা হল না আমার।

আমি নিজেও এই দলে ছিলাম এতকাল। তার পর সুযোগ এসে গেল। পেত্নীর খবর পেয়ে অমাবস্যার রাত্রে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের গ্রামের শেষেই তেপান্তরের মাঠের শুরু। ধু-ধু মাঠ। এপার ওপার দেখা যায় না। আকাশে মেঘ জমেছে। বেরুনোর সময় দেখি নি। বিদ্যুৎ চমকানোতে খেয়াল হল। সারা দিন অসহ্য গরমে কষ্ট পেয়েছি খুব। এখনো গুমোট ভাবটা আছে। একটু বাতাস নেই। প্রকৃতি যেন ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা ভেবে বোবা হয়ে আছে। মাথার ওপর দিয়ে বাদুড় উড়ে গেল। পাখা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেলাম। বেরুনোর আগের মুহূর্তেই মা বললেন—যেতে হবে না।

ভাগ্য ভাল, বাবা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তা না হলে হয়েছিল আমার পেত্নী দেখা। বাবা বললেন।—ও যাবে। ভীতু হয়ে সারাজীবন চলবে কি ভাবে?

আমি কি চিরকাল থাকব?

মা জিজ্ঞেস করলেন,—ফুলটা নিয়েছিস?

—হ্যাঁ।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন,—রিভলবারটা?

বলতে কি মায়ের কালী বাড়ির জবা ফুলটার চেয়ে বাবার রিভলবারের ওপরে আমার ভরসা বেশী। এক বারও পিছনে না ফিরে এগিয়ে চলেছি। চোখে সহ্য হয়ে এসেছে অন্ধকার, দূরে আবছা মত একটা শিয়ালকে মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যেতে দেখলাম। বিদ্যুতের আলোয় ঘড়ি দেখলাম। পকেটে অবশ্য টর্চ লাইট আছে। জ্বালাব না ঠিক করেছি। একটা জোনাকির আলো পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। মাঠের মাঝখানে পায়ে চলা রাস্তার পাশে আড়াই শ বছরের পুরনো একটা বট গাছ বিঘেটাক জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওই গাছটার গোড়ায় আমার পেঁছানোর কথা। বিদ্যুৎ চমকাল। একটু পরেই ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়ায় আরাম বোধ করলাম। বুঝলাম, কাছে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। এতকাল ভূতের সন্ধানে কোথায় কোথায় না ঘুরেছি। শ্মশানে, কবরস্থানে, পোড়ো বাড়িতে—কোথাও ভূতের টিকিট দেখার সুযোগ হয় নি। বাড়ির এত কাছে একটা পেত্নীর আখড়া আছে ওই বট গাছে। এতকাল কেউ আমাকে বলে নি। আছে এই বিশ্বাসে বেরিয়ে পড়েছি। হয়তো কাছাকাছি এসে গিয়েছি। দেখা যাক, কপাল ভাল হলে দেখা পেতেও পারি। ভূত নেই এমনতো নয়। কোথাও না কোথাও তারা আছেই। বট গাছে থাকতে অসুবিধা কি। ভূত না হয়ে পেত্নীই হল। ব্যাপারটা একই। ঝড় শুরু হল। সেই সঙ্গে বার বার বিদ্যুৎ চমকাতে থাকল। দূরে বিশাল একটা বাদুড়কে ঝুলে থাকতে দেখলাম। তখনই বিদ্যুৎ চমকাল। দেখলাম বাদুড় না, সেই বট গাছটা। গাছের গোড়াটা বিদ্যুতের আলোয় ভূল করে এক বার দেখার চেষ্টা করলাম। দেখতে পেলাম। অনেকটা জায়গা বাড়ির উঠোনের মত পরিষ্কার চারদিকে অজস্র বটের ঝুরি নেমেছে। মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে হাতির পায়ের মত। কিছু পোড়া কাঠ, মাটির গ্লাস আর এঁটো কলার পাতা দেখে বুঝলাম, এখানে বনভোজনও হয়। কাছেই বিশাল একটা দীঘির বাঁধানো ঘাট দেখলাম। বনভোজনের উপযুক্ত জায়গাই বটে। বৃষ্টি শুরু হতে না হতে শেষ হয়ে গেল। মেঘও বোধ হয় উড়ে গেছে বাতাসে অনেকক্ষন বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলাম না। চারদিকে জম-জমাট অন্ধকার। অন্ধকারের স্তব্ধ সমুদ্রের মাঝ-খানে বসে আছি। লোকালয় এখান থেকে কত দূরে জানা নেই। একটা মোটা শিকড়ের ওপরে বসেছি। এভাবে কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। মাথার ওপরের একটা ডাল কেউ জোরে দোলাচ্ছে মনে হল। পাতায় দ্রুত লয়ে বাড়ি লাগার সপ্-সপ্ শব্দ হচ্ছে। ওখান থেকে বাতাস ছুটে এসে গায়ে লাগছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে শক্ত করে রিভালবারটা ধরে থাকলাম। বেশী সময় ধরে এ অবস্থা চলল না। পরেই নাক টানার শব্দ শুনতে পেলাম। শুরু হল, কান্না। মনে হল আমার মাথায় ওপরের ডালটায় বসেই কোনো মহিলা কাঁদছেন। বুঝলাম, জীবিত অবস্থায় মহিলাটির ছিঁচ-কাদুনে স্বভাব ছিল। মায়ের মুখে শুনেছি এরকম মহিলারা কখনো সুখী হন

না। কান্নাটাই তার লক্ষণ। চীৎকার করে বললাম—আপনি যেই হন না, সামনে এসে দাঁড়ান। আমি যদি কোন উপকারে লাগতে পারি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। কথা দিলাম।

আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে এক টুকরো সাদা ধোঁয়ার মেঘ উড়ে এল। এত সাদা যে অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায়। আমার সামনে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেঘটা। মেঘের

কান্নার বেগে কথা আটকিয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন,—ভাবলাম মরলে যদি লোভ যায়। তা কই, সামান্য কুলের আচারের স্বাদ ভুলতে পারলাম না। আমার গতিও হল না। আমি মুক্তি চাই। আমার কথা মনে করে গয়ায় যদি পিণ্ডি দাও তা হলে মুক্তি পাই। আমার হাড় জুড়োয়।

বললাম,—তের বছর আগে মরেছেন, এখনো কথা পাল্টায় নি দেখছি। তিনি বুঝতে পারেন নি। চুপ



ধীরে ধীরে একটা মহিলামূর্তি বেরিয়ে এল।

ভেতর থেকে ধীরে ধীরে একটা মহিলামূর্তি বেরিয়ে এল। গলা-সমান ঘোমটার ভেতরে প্রবল বেগে কাঁদতে থাকলেন তিনি।

বললাম, কোন রকম লজ্জা করার দরকার নেই। আমি আপনার ছেলের বয়সী।

মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—বাবা! আমি বড্ড স্বার্থপর। তাই আমর এত কষ্ট। বিধবা শাশুড়ীর কুলের আচার চুরি করে খেয়েছিলাম। গঞ্জনা সইতে না পেরে এখানে এসে গলায় দাঁড় দিয়ে ছিলাম তের বছর হল।

করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বললাম,—আপনার হাড় জুড়োবে কি! আপনার কি হাড় আছে?

বললাম,—আমি আপনার নামে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দেব।

তিনি গড়-গড় করে তাঁর নাম, ঠিকানা, গোত্র বলে গেলেন। বার বার বললেন। শেষে জিজ্ঞেস করলেন, মনে থাকবেতো, বাবা?

তারপর যে ভাবে এসেছিলেন সে ভাবেই ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

আমাদের চারদিক

অসিত কুমার চক্রবর্ত্তী

গ্রাম বাংলার মাটিতে উদ্ভিদজাতীয় জৈব বস্তুটি আজও রয়েছে। হঠাৎ কোন বাধা বা বিপত্তি না আসলে এরা ভারতবর্ষের এক সম্পদ হয়ে থাকবে, তা সকলেই জানে, কিন্তু শহর থেকে এই বস্তুটি লোপাট হয়ে গিয়েছে। যদিও প্রকৃতির তৈরী এই বস্তুটি শহরের কোন পার্ক বা উদ্যানে দেখা যায় কিন্তু আসলে এগুলি কৃত্রিম উপায়ে সংগ্রহ করে জীইয়ে রাখা হয়েছে। বক্তব্যটির সারমর্ম গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত আমাদের চারিদিক রচনাংশের লেখক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

তারাদাস বাবু, তাঁর "আমাদের চারদিক" রচনাটির মধ্য দিয়ে আমাদের যে নতুন ধরনের কার্যভার দিয়েছেন তা খুবই প্রশংসার যোগ্য। তখন থেকেই আমি কাজে লেগে পড়ি। যদিও আমি উদ্ভিদ-বিশারদ নই। পর্যবেক্ষণের ভুল-ত্রুটি থাকা অসম্ভব কিছুই নয়। সপ্তাহখানেক আগে আমি এই পর্যবেক্ষণটি করি। প্রকৃতিকে ভালভাবে চিনবার জন্য আমাকে লোকালয় ছেড়ে গ্রামের দিকে যেতে হয়েছিল। সেখানে নতুন ধরনের ঘাস আর আগাছা রয়েছে। তার একপাশে বিলের মাঠ, সেখানে হোগলার বন আর নলখাগড়ার ঝোপ।

পরদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বিলের দিকে গেলাম। সেখানকার প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা নিড়েনি চেয়ে নিলাম। তারপর এক বর্গগজ পরিমাণ চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডটি নিড়েনি দিয়ে এঁকে নিলাম। স্থানটি ঘাস আর আগাছায় ভর্তি ছিল। জায়গাটা আমার পছন্দ হয়ে যায়। এরপর হাঁটু গেঁড়ে বসে ঐ এক বর্গগজ ভূমিখণ্ডটির মধ্যে যে কয়টি উদ্ভিদ পেলাম, সব কয়টি তুলে তুলে আলাদা করে রাখতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক পর যখন কাজ শেষ করলাম তখন শরীর একেবারে ঘর্মাক্ত। ঘাসই পাওয়া গেল ৫/৬ রকমের। নানান ধরনের শাক এবং আরো কিছু বন্য উদ্ভিদ পাওয়া গেল ঐটুকু জায়গা থেকে। ১৫/১৬ রকমের গাছ ই বের হল ঐটুকু জায়গা থেকে।

এর পর, আমি এক একটি গাছ তুলে তুলে পর্যবেক্ষণে মন দিলাম। প্রথম যে গাছটি তুললাম তার নাম 'মুথা ঘাস' এর পরের একটিকে অর্থাৎ একটি ঘাস তার নাম দুর্বা ঘাস। ঘাসগুলো একটু লম্বা ধরনের। এর পর একটা লতানো গাছ তার পাতা খাঁজ কাটা এবং নাম 'থানকুনি গাছ'। আর একটি ঘাস তুলে নিয়ে দেখলাম যে তার আগায় ধানের শীষের মত একগুচ্ছ শিষ রয়েছে, গাছটিকে দেখে চিনলাম। এই গাছগুলেকে কেউ কেউ বলেন চোরকাঁটা গাছ আবার অনেকে বলেন 'চোরা ধানের শীষ'। এবার কুকুরের লেজের মতো কুঁকড়ানো একরকম গাছ দেখলাম, নাম,লাইকোপোডিয়াম। এর পর আরেকটি গাছকে তুলে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। গাছটি যেখানে জন্মেছিল সে জায়গাটা ছিল একটু কর্দমাক্ত কিছু ছত্রাক ও সেখানে জন্মেছিল আর তারই মধ্যে জন্ম নিয়েছিল ঐ গাছটি। গাছটির মাথা খুব বেশী উচু নয়। পাতা খস-খসে, অমসৃন, পাতাটি দৈর্ঘ্যে চার ইঞ্চি আর প্রস্থে এক ইঞ্চি তার মধ্যে থেকে লম্বা ডাট বেরিয়ে মাথায় একটা ফুল সৃষ্টি করেছে। গাছটির নাম মার্কেন দিয়া। এর পর কতকগুলি শাক জাতীয় গাছ দেখতে পেলাম। প্রথম যে গাছটিকে তুললাম, লোকে এগুলিকে বলে 'শুশনি শাক।' এর পর আর একটি গাছ তুলে নিলাম। গাছটি পাঁচ ইঞ্চির মত লম্বা এর নাম নোটে শাক। এর পর যে গাছটিকে দেখলাম, লোকে একে আমরুল বলে থাকে। আরো অনেক উদ্ভিদ ঐ একবর্গ গজ ভূমি খণ্ডের মধ্যে দেখতে পেলাম, যে গুলির নামও আমি জানতাম না। যার ফলে পর্যবেক্ষণের কিছু ত্রুটি থেকে যায়।

সেদিনের ঐ একবর্গগজ ভূমির মধ্যে যা পেলাম তাই দেখে বাংলা দেশেরই এক গায়কের কণ্ঠ সঙ্গীত মনে পড়ে যায়, 'এ মাটি সোনার মাটি এই মাটিতে কতই সোনা ফলে।' সত্যিই তো, এ মাটি সোনার মাটি, এই মাটি চির পুণ্যময়। আর, আমাদের চারদিকে প্রকৃতির যে একটা খেলা চলছে, কয়জনে তার খোঁজ রাখে? আমরা যারা বুঝিনা তারা ঐ সব নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ গুলিকে দলে মাড়িয়ে চলে যাই। অথচ ওরাই দিতে পারে জীবন দান, ওদের ভেতর লুকিয়ে আছে এক গভীর রহস্য।



অতিপ্রাকৃত শক্তি দৈববাণী জাদুবিদ্যা ইত্যাদিতে অযৌক্তিক অন্ধ বিশ্বাস হলো এমনই এক জিনিস, যার প্রতি অনেক মানুষই অবজ্ঞা পূর্ণ উপহাস করে থাকে। তবুও পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে শুধু সাধারণ মানুষেরই নয়, অনেক রাজা-মহারাজার ভাগ্যও আন্দোলিত হয়েছিল কিছু অমূল্য জহরত বা কোন কোন ধরনের অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বস্তুর ভাল কিংবা মন্দ প্রভাবের দ্বারা। তবে এ সম্পর্কে জুয়েলস্-এর বদনামটাই বেশী পরিমাণে রয়ে গেছে। যেসব নিখুঁত সৌন্দর্যময় চোখধাঁধানো রত্নের পিছনে আতঙ্ক আর রক্তের দাগ রয়েছে, তাদের তালিকা কিন্তু খুব ছোট মনে হয় না।

ওই সব রক্তরঞ্জিত মণির মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত বোধ হয় কোহ্-ই-নূর, যা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রানী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দিয়েছিল। এই রত্নটির জন্যে মানুষ ষড়যন্ত্র করেছে গোপনে, হত্যা করেছে, ভ্রাতৃহত্যা হয়েছে এবং নিজের উনিশ বছর বয়স্ক সন্তানের হাতে মৃত্যু হয়েছে পিতার। মণিটি তখনও ইংলণ্ডের ক্রাউন জুয়েলস-এর একটা অংশ হয়ে ওঠে নি। তার আগে অনেক জঘন্য অপরাধ ঘটেছিল মণিটিকে ঘিরে। প্রায় বিনা রক্তপাতে কখনও এ মণিটির দখল ছাড়তে চায় নি কেউই।

তবে কোহ্-ই-নূর মণির জন্যে যারা দুর্ভাগ্যের বলি হয়েছিল, তাদের তালিকায় ছিল একটি মাত্র স্ত্রী-লোক। সেও খুন হয় তার নিজের পুত্রবধূর হাতে। বধূটি আর কেউ না, যে ছেলেটি তার বাবাকে খুন করেছিল, এ তারই স্ত্রী।

রাশিয়ার রোমানফ্ পরিবারের কাছে পান্না ছিল স্পষ্টভাবে নিয়তির প্রতীক। তাদের ভাগ্যে পান্নার ক্ষতিকর প্রভাব বারে বারে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিশেষ করে একটা জুয়েলকে তোলো হতো—'দ্য এমারাল্ড অব্ ডেথ'। সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনকে সেটা পরে থাকতে দেখা গিয়েছিল তার একটা নাটকীয় পরিণতির সময়ে।

আর একটি বিশেষ অঙ্গুরীয়'র খবর পাওয়া যায় স্পেনে। সেটা "মেফিস্টোস্ রিঙ্" নামে পরিচিত ছিল। স্পেনে তখন দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকাল। এই অঙ্গুরীয়টি তার মালিকদের জন্যে শুধু ট্র্যাজেডি আর দুঃখছাড়া ভাল কিছু বয়ে আনে নি কোন সময়ে।

তারপর, একদিন অনেক চিন্তার পর অঙ্গুরীয়টিকে রেখে দেওয়া হয় একটি চার্চের মধ্যে। আশা হয়েছিল এর ফলে হয়তো অঙ্গুরীয়টির ওই মারাত্মক ভয়ানক কুপ্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে।

তখন স্প্যানিস-আমেরিকান যুদ্ধ বেঁধেছে। কয়েক মাসের মধ্যে রহস্যজনকভাবে আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে গেল ওই চার্চটি।

এদিকে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে অঙ্গুরীয়টিকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল একেবারে অক্ষত অবস্থায়!

তবে সেটা তখন হারিয়ে গেলে হয়তো ভালই হতো। কারণ কোন মানুষই আর অঙ্গুরীয়টিকে পছন্দ করে কাছে রাখতে চায় না। তাই সেটাকে রেখে দেওয়া হলো একটি মিউজিয়মের মধ্যে।

কিন্তু অতি অল্পদিনের ভেতরে ওই মিউজিয়মের শিরে নেমে এলো আকাশ থেকে অগ্নিময়ী বিধ্বংসী বাজ। মিউজিয়মটিকে প্রায় ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেল।

তাতেও দেখা গেল, ওই অঙ্গুরীয়টির কোন ক্ষতি হয় নি। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে ফের উদ্ধার পেয়ে গেল সেটা প্রায় অক্ষত অবস্থায়।



অঙ্গুরীয় ও মিউজিয়াম

এসময়ে অঙ্গুরীয়টিকে ফের রাজপরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাদেরই জিনিস, এখন তারা যা করতে চান করুন সেটাকে নিয়ে, রাজপরিবারের মধ্যে অঙ্গুরীয়টির সঙ্গে তাই ফের পিছু ধাওয়া করে এলো অমঙ্গলের ছায়াও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্প্যানিশ নেভীর পরাজয়ের খবর এলো। কিউবা এবং ফিলিপিনস্-এর দখল হাতছাড়া হয়ে গেল তাদের।

ওটাই ছিল তখনকার রাজপরিবারের প্রতি অঙ্গুরীয়টির সর্বশেষ আঘাত। অতঃপর সেটাকে একটা মজবুত বাক্সে ভরে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা হয়। এবং পরিশেষে একদিন মাটির অন্ধকারের মধ্যেই হারিয়ে যায় ওই অভিশপ্ত "মেফিস্টোস্ রিঙ্।"

এবার একটা অতি তুচ্ছ সাধারণ পুঁতির মালার কথায় আসা যাক:

একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় বেড়াতে গিয়েছিল এক ইংরেজ মহিলা। সেখান থেকে সে যখন ফিরে আসে, তখন নানা জিনিসের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটা পুঁতির মালা। সাধারণ পুঁতির মালা হলেও সেটাকে দেখতে ছিল খুব সুন্দর। জনৈক কাফ্রি তাকে উপহার দিয়েছিল ওই মালাটি। আর, ঠিক তারপর থেকেই দুর্ভাগ্য যেন মহিলাটির নিত্যসাথী হয়ে গেল। একদিন গুরুতর এক দুর্ঘটনার মধ্যে পড়লো সে। একবার তার নিজের প্রায় সমস্ত টাকা পয়সাও খোয়া গেল। একদিন বাড়িতে আগুন লেগেও ক্ষতি হলো যথেষ্ট।

তবু অমন একটা সাধারণ পুঁতির মালার সঙ্গে এমন শোচনীয় দুর্ভাগ্য জড়িয়ে থাকতে পারে, এটা তার কল্পনাতেও ছিল না। সে তার নিজের মেয়েকে ভালবেসে উপহার দিল মালাটি। অর্থাৎ শৌখিন একটা সাধারণ পুঁতির মালা নয়, মেয়ে উপহার পেল নিজের মায়ের কাছ থেকে ভবিষৎ কোন অঘটনই। দুজনের কেউই সেটা ধারণা করতে পারে নি।

ওই মেয়ে মঞ্চের একজন নামকরা অভিনেত্রী ছিল। সে হঠাৎ একদিন এমন এক দুর্ঘটনায় আহত হলো যে ভবিষ্যতে তাকে কোন দিনের জন্যে মঞ্চে দর্শক সাধারণের সামনে আর উঠে দাঁড়াতে হলো না।

অতঃপর ওই পুঁতির মালাটি সম্পর্কে সর্বশেষ জানবার কৌতূহল জাগলো অনেকের মনে। ভূত প্রেত নিয়ে যারা গবেষণা করে, তাদের একজন 'মিডিয়ম মারফৎ জানিয়ে দিল যে পুঁতির মালাটি ছিল নাকি একজন আফ্রিকার আদিবাসীর। তাকে জঘন্য ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তাই একটা অমঙ্গল প্রভাব থেকে যায় তার ওই পুঁতির মালাটিতে।

সেই ইংরেজ মহিলা তারপর এ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পেরেছিল, আদিবাসীটির হত্যা কাহিনী আদৌ মিথ্যে নয়।

পুঁতির মালাটিকে নষ্ট করে ফেলার পর আবার মা মেয়ে সুদিনের মুখ দেখতে সুরু করে।

বুদ্ধির্যস্য

দীপঙ্কর রায়

হাজার বছর আগেকার কথা। তখন ভারতবর্ষে আনাচে কানাচে অনেক সাধুসন্ন্যাসী তপস্যা করতেন। পর্বতের গুহায়, কিম্বা কোন নির্জন স্থানে চলতো তাঁদের তপস্যা। সেইসব রাগী তপস্বীদের ভয় করে চলতেন দেবতারাও। এই রকম এক তপস্বীর গল্প শোনাব আজ তোমাদের।

হিমালয়ের কোলে যে সব অসংখ্য ছোট বড় পর্বত-শৃঙ্গ আছে, তাদেরই কোন একটির এক অন্ধকার গুহায় তপস্যা করছিলেন এক ঋষি। হঠাৎ দেখলে মানুষ বলে মনেই হয় না। কঙ্কালসার দেহ, পদ্মাসনে বসে আছেন। দুটি চোখের দৃষ্টি নাসাগ্রে নিবদ্ধ। তাঁর শত বৎসরের তপস্যার সিদ্ধিলাভের পূর্বক্ষণ উপস্থিত। এই সময় যত বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার কথা। তপস্বী প্রাণপণে ধ্যান করে চলেছেন যাতে কোন বিঘ্নেই তাঁর ধ্যানভঙ্গ না হয়।

এই সময় তাঁর কানে এলো একটা শব্দ। খট্ খট্ খট্ খট্—এই রকম একটানা শব্দ। শব্দটা ক্রমশঃ যেন জোরালো হচ্ছে। তপস্বীর দিকেই যেন এগিয়ে আসছে। জোরে, আরো জোরে এগিয়ে আসতে লাগলো শব্দটা। অবশেষে তপস্বী আর নিজেকে সংযত করতে পারলেন না, ধ্যান ভেঙে গেল তাঁর।

চোখ মেলে সমুখে তাকিয়ে দেখেন হাঁটুর উপর ধুতি-পরা এক বৃদ্ধ চলেছেন তাঁর সামনে দিয়ে। ও শব্দ ওই বৃদ্ধের খড়মের শব্দ। এবার তপস্বীর ক্রুদ্ধ হবার পালা। প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠে তিনি বললেন—'কে হে তুমি বৃদ্ধ? জানো আজ আমার সিদ্ধি-লাভের দিন ছিল। তুমি তোমার খড়মের শব্দে আমার ধ্যান ভাঙিয়েছো! তোমাকে আমি ভস্ম করে দেবো।'

বৃদ্ধ অতি বিনীত এবং নম্র হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। বললেন, 'আজ্ঞে আমাকে মার্জনা করবেন। আমি বিধাতাপুরুষ। আমি চলেছি এই পর্বতের নীচে যে গ্রাম আছে সেখানকার জমিদারের পুত্র-সন্তানের বিধিলিপি লিখতে।'

তপস্বী কিন্তু বৃদ্ধের পরিচয়ে দমবার পাত্র নন। বললেন—'তুমি যে অপরাধ করেছো তা ক্ষমারও অযোগ্য। এখন আমার কথা না শুনলে তোমাকে আমি এই মুহূর্তেই ভস্ম করে দেবো।'

এ কথায় বিধাতাপুরুষ ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, 'আজ্ঞে বলুন, আমাকে কি করতে বলেন।'

তপস্বী বললেন, 'তুমি ওই জমিদারের পুত্র-সন্তানের ভাগ্যে কি লিখলে সেটা আমাকে ফিরবার পথে বলে যেতে হবে।'

বিধাতাপুরুষ সে কথায় সম্মতি দান করে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরবার পথে তপস্বীকে জানিয়ে গেলেন—ওই জমিদারপুত্রের আঠারো বছর

বয়স হলে সে তার জমিদারি এবং স্বজন-বন্ধু সমস্ত হারিয়ে একটি চালা ঘরে বাস করবে। আর তার সঙ্গী বলতে একটি গরু থাকবে। তারই দুধ বিক্রি করে তার দিন চলবে।'

অনেক বছর আগে গ্রামের জমিদার ছিলেন সূর্যকান্ত রায়। এখন তার জমিদারি লোপ পেয়েছে। স্বজন-বান্ধব সব হারিয়ে সূর্যকান্তের একটি সতেরো আঠারো বছরের ছেলে গ্রামের শেষপ্রান্তে এক গোয়ালঘরে বাস করে।



'......তোমাকে আমি এই মুহূর্তে ধ্বংস করে দেবো।' পৃঃ—উনসত্তর

বিধাতাপুরুষ তাঁর বিধিলিপি শুনিয়ে যাবার পর আঠারো বছর কেটে গেছে। একদিন সেই তপস্বী পর্বতগুহা ছেড়ে নীচে সমতলে নেমে এলেন। পর্বতের নীচে এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। তপস্বী খোঁজ নিয়ে জানলেন,

তপস্বী গ্রামের শেষপ্রান্তে গিয়ে দেখলেন, সত্যিই সেখানে একটি ফুটফুটে সুন্দর আঠারো-উনিশ বছরের যুবক এক চালাঘরে বাস করছে। তার সঙ্গে একটি নধর গাই।

তপস্বীকে দেখে ছেলেটি বাইরে এসে তাঁকে প্রণাম করলো। বললো, 'বলুন গুরুদেব আপনার জন্য কি করতে পারি।'

'কিছু না।' উত্তর দিলেন তপস্বী। বললেন, 'আমি যা বলছি তাই কর। তা নৈলে তোমাকে ভস্ম করে দেবো।'

—'বলুন গুরুদেব, কি আজ্ঞা আমার প্রতি।' যুবক বললো।

—'তোমার এই গরুটির দুধ দুইয়ে নিয়ে একে হাটে বিক্রি করে দিয়ে এসো।'

—'সে কি গুরুদেব, এই গরুটি থেকে যে আমার জীবন চলে।'

—'কথা না শুনলে ভস্ম করে দেবো। এখুনি যাও একে বিক্রি করে এসো।'

অতঃপর যুবক গরুটিকে বিক্রি করে দিয়ে এলো কাঁদতে কাঁদতে। পরদিন কিন্তু দেখা গেল তার গোয়ালে সেই নধর গরুটি আগের মতই বাঁধা আছে।

এবারও তপস্বী নির্দেশ দিলেন গরুটির দুধ দুইয়ে নিয়ে তাকে বিক্রি করে আসতে। যুবক তখন কাঁদো কাঁদো স্বরে তপস্বীর পা জড়িয়ে ধরলো। বললো—'গুরুদেব, একবার কোনক্রমে এটি ফেরত পেয়েছি, আর বলবেন না।'

তপস্বী কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল। অতঃপর যুবককে গরুটি বিক্রি করে আসতেই হল। পরদিন কিন্তু দেখা গেল গরুটি আবার স্বস্থানে ফিরে এসেছে।

এবার যুবকটি খুবই অবাক হল। এমনটা কিভাবে সম্ভব হল সেটা জানার জন্যে সে উঠেপড়ে লাগলো। তপস্বীর কাছে গিয়ে সে তাঁর মহিমাকীর্তন করে বলল —'গুরুদেব, এ সবই আপনার মহিমা। কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব করছেন আমাকে বলতেই হবে।'

তপস্বী হাসলেন। বললেন যদি জানতে চাও, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে জাগতে হবে।

সেদিন রাত্রে, তপস্বী ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। পাশে জমিদারপুত্র উপবিষ্ট। তপস্বী চোখ বুজিয়ে ধ্যান করছেন। জমিদারপুত্রের একটু তন্দ্রা এসেছে শেষ রাতে। হয়তো একটু ঘুমিয়েও পড়েছে। এই সময় তপস্বী তাকে মৃদু ধাক্কা দিলেন। বললেন— 'চোখ মেলে দেখ যুবক।'

দেখা গেল সমুখের সরু গলিপথ দিয়ে, একজন হাটুর উপর ধুতি-পরা বৃদ্ধ একটি গরুর লেজ মুচোড়ে ধরে নিয়ে আসছেন। তার হাতে একটি লাঠি, মুখে 'হ্যাট্-হ্যাট্' শব্দ করছেন। পায়ে কিন্তু আর খড়ম নেই। একেবারে খালি পা।

যুবক জিজ্ঞেস করলো, 'ওটি কে গুরুদেব?'

—'ও বিধাতাপুরুষ। তোমার জন্মের সময় ও তোমার ভাগ্যে লিখেছিল ওই গরুর দুধ বেচে তোমার দিন চলবে। তাই প্রতিদিন তোমার বিক্রীত গরু ওকে ফেরত দিয়ে যেতে হবে। আজ থেকে তুমি প্রতিদিন ওই গরু বিক্রি করবে এবং প্রাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করবে। আমি এক বছর পর ফিরে এসে যেন দেখি তোমার ওই জমিদারির দ্বিগুণ তুমি তৈরি করেছো। দেখি, ও কেমন বিধাতাপুরুষ।'

এই বলে তপস্বী চলে গেলেন।

ভারতবর্ষ নাম হল কেন?

মল্লিকা মুখোপাধ্যায়

অনেকের ধারণা, রাজা দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের নাম থেকে আমাদের দেশের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ! এ ধারণা ভুল। প্রাচীনকালে হিন্দুরা সারা পৃথিবীকে সাত ভাগে ভাগ করেন—জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও শাল্মলী। তাই পৃথিবীকে বলা হত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। জম্বুদ্বীপে রাজা ঋষভ রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্য ন' ভাগে বিভক্ত ছিল—কুরু, হিরন্ময়, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, কিম্পুরুষ ও ভারত। এই ন' ভাগের এক একটির নাম ছিল বর্ষ।

রাজা ঋষভের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত যে বর্ষের রাজা ছিলেন তার নাম ভারতবর্ষ। জম্বুদ্বীপ সম্ভবতঃ বর্তমানের এশিয়া মহাদেশ।

চোখ বুজে এ কী দেখলাম

চন্দনা দত্ত

ছোটবেলায়, আমাদের গরমের ছুটিটা সব থেকে ভাল লাগত। তখন, গরম পড়লে কি হবে? আমরা ছোট কাকার সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে যেতে পারতাম, বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে অনেকগুলো ফুচকা আর আলুকাবলি খেতে পারতাম। কেউ টের পেত না, কারণ বড়রা অত রোদে রাস্তায় বেড়াবার কথা ভাবতেও পারতেন না। তাঁরা যখন বেরোতেন তখন আমরা পুরো দমে খেলতে শুরু করে দিয়েছি।

এরকমই একটা গরমের ছুটিতে আমাদের আনন্দটা একটু বেশী হয়েছিল। সেবার দুর্গাপুর থেকে আমার জ্যেঠামণি, জ্যেঠাইমা আর দাদা এলেন। বাড়িতে লোক আসা মানেই পড়তে হবে কম। তাছাড়া জ্যেঠামণির মত একজন যখন এসেছেন, তখন তো কথাই নেই। আবদার আর বায়না, দুটোই বেশ চলত তার কাছে। সেই সময় বেলেঘাটার লেকে বেড়াতে যাওয়া আমাদের কাছে একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল, কারণ সেখানে অনেক রকম কম পয়সার সুখাদ্য পাওয়া যেত! কিন্তু কম পয়সা হলেও একমাত্র আমাদের জ্যেঠামণি ও দাদু ছাড়া কেউই তা কিনে দিতেন না। অতএব ঠিক হল—আমরা জ্যেঠামণির সঙ্গে একদিন লেকে বেড়াতে যাব। বেরোবার আগে মা অবশ্য সাবধান করে দিলেন। কিছু বাজে জিনিস যেন না খাই। জ্যেঠামণিকে ভাল মানুষ পেয়ে আমাদের বন্ধুরা, পাশের বাড়ির রিনা, টুটুল আর শিবুদাদাও সঙ্গে চলল। উঃ! জ্যেঠামণি কি ভাল, বন্ধুদেরও সঙ্গে নিয়েছেন, আমরা লেকে গিয়ে আরও কত মজা করতে পারব।

তা মজা অবশ্য হয়েছিল। সারাটা বিকেল আমরা নরম ঘাসের উপর অনেক রকম খেলাই খেলেছিলাম। কিন্তু জ্যেঠামণি যেই বলে ওঠেন—"নে, নে, চল্, এবার বাড়ি যেতে হবে," অমনি আমরা খেলতে খেলতে আরো দূরে পালিয়ে যাই। এরকম করতে করতে যখন আমরা বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ক্লান্ত শরীর, কোনরকমে পা দুটোকে টেনে চলেছি। এমন সময় দাদা বায়না ধরল যে অন্ততঃ একটা গ্যাসের বেলুন কিনে দিলে আমরা তাড়াতাড়ি বাড়িতে হেঁটে যেতে পারব। তাই হল—প্রত্যেকের হাতে রং বেরঙের বেলুন এল। বেলুন হাতে নিয়েই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়ে ফেলি বলে আমাদের তা কখন কিনে দেওয়া হত না, আর এখন জ্যেঠামণি কি না গ্যাস বেলুন কিনে দিয়েছেন।

কিন্তু বেলুন হাতে পাবার পরেও হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, চোখ দুটো ঘুমেতে জ্বালা করতে শুরু করে দেয়। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে চোখ বুজেই হাঁটতে থাকি। ভাবলাম, এতগুলো লোক সঙ্গে আছে, আমি যদি পথের ধারে ড্রেনের দিকে বা পথের মাঝে গাড়ির দিকে চলে যাই, তাহলে কেউ না কেউ ধরবেই—ই।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। চোখ বুজে আমি চলেছি, বেশ ভালই লাগছে, দোকানের আর গাড়ির ঝলমলে আলো চোখে লাগছে না, আর সেইজন্যই মাথাটাও বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ, অনেক-গুলো লোক যেন একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—সর্বনাশ! নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা হয়েছে। অগত্যা চোখের পাতা খুলতেই হল। কি—নৃ—তু একি! সত্যি আমি? একটা কাল রঙের রাস্তার কুকুরের পিঠে? ঠিক যেন একটা বেঞ্চে বসে আছি। আমার পাদুটো কুকুরটার গায়ের একটা দিক বেয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে। আর কুকুরটা রক্তবর্ণ চোখে, ঘাড় বেঁকিয়ে, বড় বড় ধারালো দাঁত বার করে আমাকে এবার কামড়াবেই।

মা—আ—আ—!! প্রচণ্ড এক ধাক্কায় আমার ছোট্ট শরীরটা সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছিল, সামলে নিলাম।

এতো শুধু গল্প নয়

প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী

হাওড়া জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামের নাম সামতাবেড়। এই গ্রামের ভেতর দিয়ে সাপের মতো এঁকে-বেঁকে বয়ে গেছে রূপনারায়ণ নদী। এই নদীর ধারে শান্ত পরিবেশে এক বাঙালী ভদ্রলোক বর্মা দেশ ছেড়ে বাংলা দেশে ফিরে এসে সুন্দর একখানা বাড়ি তৈরি করিয়ে ঐ গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে বাস করতে লাগলেন।

সামতাবেড় দরিদ্র গ্রাম; কারণ এই গ্রামের অধিবাসীরা হলো সামান্য চাষাভুষো মানুষ। এই গরিব গ্রামে চিকিৎসার জন্যে ভালো ডাক্তার পর্যন্ত পাওয়া যায় না! যে ভদ্রলোকটি এখানে এসে বাস করছেন, তিনি নাকি অনেক যত্ন করে শিখেছিলেন হোমিওপ্যাথি আর বায়োকেমিক চিকিৎসাপ্রণালী। গ্রামে গরিব চাষাভুষো আর দীন-দরিদ্র অধিবাসী আছে। ভদ্রলোক ওদের ঘৃণার চোখে না দেখে আনন্দের সঙ্গে তাদের ডেকে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। শোনেন তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী! তাদের ছেলে-মেয়ের কারো অসুখ করেছে শুনলে তাদের ডেকে ওষুধ দেন বিনামূল্যে। প্রয়োজন হলে তাদের বাড়িতে গিয়েও রোগীকে দেখে আসেন। ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে তোলেন তাদের। দরিদ্র গ্রামবাসীরা অনেক সময় রোগীর উপযুক্ত পথ্যও যোগাড় করতে পারত না অর্থের অভাবে। তাই ভদ্রলোককেই অনেক সময় নিজের পয়সা খরচ করে তাদের পথ্যের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। এইভাবে কয়েক মাসের মধ্যেই ভদ্রলোক গ্রামবাসীদের কাছে দাদাঠাকুর নামে পরিচিত হয়ে যান!

এই ভদ্রলোকের একটা পোষা কুকুর ছিলো—ফরেন ব্রীড্ নয়, রাস্তার নেড়ী-কুকুর। একদিন ভদ্রলোক গ্রামের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিকেলের দিকে। তখনই এই কুকুরের বাচ্চাটা পিছু নেয়। তাঁকে অনুসরণ করে চলে আসে অনেকটা পথ গুটু গুটু……করে হাঁটতে হাঁটতে। ভদ্রলোক পেছন পেছন আসতে দেখে বেশ বিব্রত হয়ে পড়লেন! ভাবলেন, অন্য পাড়ার বড়ো কুকুর এসে বাচ্চাটাকে শেষে মেরে না ফেলে। তা-ই তিনি কুকুরের বাচ্চাটাকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলেন বাড়ির দিকে। কোলের ভেতর থেকে বাচ্চাটাকে করুণভাবে পিট্-পিট্ করে তাকাতে দেখে ভদ্রলোকের বেশ মায়া পড়ে যায় বাচ্চাটার ওপরে। তাই তিনি তাকে ছেড়ে না দিয়ে নিয়ে আসেন সামতা বেড় থেকে তাঁর বাজে-শিবপুরের বাড়িতে। এখানে নিয়ে এসে বেশ যত্নে তাকে পুষতে থাকেন—নাম রাখলেন 'ভেলু'!

ভেলু এই ভদ্রলোকের বাড়িতে তাঁর ছেলে-মেয়ের মতোই আদরযত্নে বড়ো হতে থাকে। ভদ্রলোকের কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না বলেই হয়তো ভেলু এতটা আদর ও যত্নে প্রতিপালিত হয়েছিলো ভদ্রলোকের কাছে। উপযুক্ত খাদ্য আর আদর-যত্নে ভেলু দেখতে দেখতে শেষে হয়ে দাঁড়িয়েছিলো আকারে ঠিক মোটা একটা কেঁদো-বাঘের মতো। তার প্রতাপে ভদ্রলোকের বাড়িতে কোন অপরিচিত লোকের ঢুকবার উপায় ছিল না; মনিবের আদেশ না পেলে সে কখনই অচেনা লোককে শুধু ঘরে কেন বাড়ির ভেতরেও ঢুকতে দিতো না। এই নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। বলছি শোনো—

একবার মিউনিসিপ্যালিটির এক কর্মচারী ট্যাক্স আদায় করতে এসে ভেলুর কাছে ভীষণ রকমে জব্দ হয়েছিলেন। ট্যাক্স নিতে কর্মচারীটি যখন ভদ্রলোকের বাজে-শিবপুরের বাড়িতে ঢোকেন তখন মনিবের আদেশে ভেলু তাঁকে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে দিয়েছিলো। তখন ভেলু তাঁকে কিছুই করে নি। মনিব কর্মচারীর হাতে টাকা দিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিলেন স্নানাহার করতে।

স্নানাহার সেরে ভদ্রলোক বৈঠকখানা ঘরে এসে দেখেন, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীটি তখনও টাকাটা হাতে নিয়ে করুণ চোখে ঐ ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপছেন, আর ভেলু তাঁকে আগলে বসে গর্‌-গর্‌……শব্দ করতে করতে পাহারা দিচ্ছে! মনিবের আদেশ না পেলে ভেলু তাঁকে টাকা নিয়ে এক পাও এগুতে দেবে না!

বৈঠকখানায় ঢুকে এই দৃশ্য দেখে ভদ্রলোক তো অবাক্‌! শুধু অবাক্‌ই নয়, তিনি ভেলুর এই ব্যবহারে বেশ দুঃখিত আর লজ্জিতও হলেন। অন্য কেউ হলে হয়তো কর্মচারীটির অবস্থা দেখে হাসিতে ফেটে পড়তেন, কিন্তু ইনি তা করলেন না। ইনি কোনোরকমে ভেলুকে সামলে রেখে কর্মচারীটিকে মুক্ত করলেন। এতক্ষণে কর্মচারীর ধড়ে প্রাণ এলো! তিনি হাঁফ ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট……যাবার সময় বলতে বলতে গেলেন, বাপরে, বাপ! আর কখনো এ বাড়িতে পা দিচ্ছিনে, আর একটু হলেই প্রাণটা গেছলো!

একবার ভেলুর ভীষণ অসুখ করলো। ভদ্রলোক অনেক চিকিৎসা আর সেবা-যত্ন করেও তাকে বাঁচাতে পারলেন না! ভেলু মারা যাবার পরে ভদ্রলোক ঠিক ছেলেমানুষের মতো হাউ-হাউ……করে' কাঁদতে লাগলেন। তারপরে কোনো রকমে শোকটা সামলে নিয়ে ভেলুর মৃতদেহ নিজের বাড়িরই বাগানের এক পাশে পুঁতে দিয়ে সেই সমাধির ওপরে একটি স্তম্ভও তৈরি করিয়ে দিলেন!

এ হেন কুকুর-প্রিয় ভদ্রলোকের সামতাবেড়ের বাড়ির বাগানের এক গাছতলায় বেওয়ারিশ একটা কুকুরের তিন-চারটে বাচ্চা হয়েছিলো। ভদ্রলোক এটা লক্ষ্য করেছিলেন, আর এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, কুকুরটা সারা গাঁ ঘুরে বেড়ালেও ঠিক সময়ে এসে দু-তিনবার করে' বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে যেতো। কিন্তু একদিন হঠাৎ এর ব্যতিক্রম ঘটলো! কুকুরটা সারাদিনে একবারও বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে এলো না! এদিকে ক্ষিদের জ্বালায় বাচ্চাগুলো কুঁই-কুঁই……করছে! ব্যাপার দেখে ভদ্রলোক অস্থির হোয়ে পড়লেন। বাড়ির আর আশেপাশের লোকজনদের ডেকে বললেন, এই বাচ্চাদের মা-কে শীগ্‌গির খুঁজে বের করো। যে বের করে আনতে পারবে তাকে দশ টাকা বকশিস্‌ দেবো।

বকশিসের লোভে তখনই চারদিকে লোক ছুটলো কুকুরটাকে খুঁজে বের করার জন্যে! আর এদিকে? এদিকে ভদ্রলোক একবাটি দুধ আর তুলোর পলতে নিয়ে গাছতলাতে বসে নিজেই বাচ্চাগুলোকে কোলের ওপরে তুলে নিয়ে মায়ের মতোই সযত্নে বাচ্চাগুলোর মুখের ভেতরে পলতে দিয়ে দুধ দিতে লাগলেন। তখন বাচ্চাগুলো উল্লাসে চক্‌-চক্‌……করে' সেই দুধ পান করতে লাগলো! এই দেখে ভদ্রলোকও উল্লসিত হয়ে উঠলেন! ভাবলেন, যাক, বাচ্চাগুলো এবার প্রাণে বাঁচবে!

অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বাচ্চাগুলোর মা-কে খুঁজে পাওয়া গেল,—গাঁয়েরই এক জলশূন্য কুয়োর ভেতরে। কেমন করে ও যেন পড়ে গিয়েছিল ওর ভেতরে, কিন্তু আর উঠে আসতে পারে নি। শেষে গাঁয়ের লোকেরাই বকশিসের লোভে কুয়োর ভেতরে নেমে ওকে তুলে নিয়ে এসে হাজির করলে ভদ্রলোকের কাছে। ভদ্রলোক তখন খুশী হয়ে তাদের দশটাকার জায়গায় পনেরো টাকা বকশিস্‌ দিয়ে খুশী করলেন। মা-হারা বাচ্চাগুলো তাদের মা-কে ফিরে পেয়ে আনন্দে লেজ নাড়তে লাগলো, ভদ্রলোকেরও মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তির হাসি।

আমি এতোক্ষণ তোমাদের কাছে যে ভদ্রলোকের কথা বলছিলাম তিনি কে জানো?—ইনিই হলেন তোমাদের সকলের প্রিয় অপরাজেয়, দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একত্রিশে ভাদ্র হলো এঁর জন্মদিন। এঁর লেখা প্রথম রচনা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেই যেন নিঃশব্দে উচ্চারণ করেছিলো, "আমি এলাম, দাঁড়ালাম, জয় করলাম!" সত্যিই চারিদিকে বিপুল বিস্ময়ের সৃষ্টি করে ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন যার রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে,—নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি! এমন দরদী কথাশিল্পী আমাদের দেশে আর জন্মায় নি। যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল আর উৎপীড়িত,—মানুষ যাদের চোখের জলের কোনো হিসেব নিলে না, তাদের কথাই ইনি লিখে গেছেন গভীর দরদ দিয়ে। সাধারণ মানুষের দুঃখ, অভাব আর অভিযোগ ইনি যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে এঁর প্রশংসা না করে উপায় নেই। এঁর এই সহানুভূতি, এই দরদ শুধু মানুষের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মূক প্রাণীদের প্রতিও ইনি ছিলেন সমান দরদী! এই দরদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো 'ভেলু' আর 'মহেশ'।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনে একটা বেদনাসিক্ত অভিমান ছিলো। এই বেদনা বা এই অভিমান তাঁর একান্তই নিজস্ব। এখানে তিনি কখনোই কাউকেই প্রবেশ করতে দিতে চান নি, চান নি কাউকে কোনো অংশ দিতে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত এই বেদনাই তাঁর সাহিত্যকে মানুষের মর্মস্পর্শী করে তুলতে সাহায্য করেছে এই ছিলো তাঁর ধারণা। তিনি নিজে জীবনের নানা দিক্‌ দিয়ে বঞ্চিত না হলে এমন গভীর হার্দ্য সাহিত্য হয়তো আমরা পেতাম না!

শরৎচন্দ্রের জন্মদিন আমাদের দেশে অক্ষয় আর অম্লান হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হতে থাকুক, এসো আমরা সকলে মিলে তা-ই প্রার্থনা করে তাঁর স্মৃতি আমাদের মনের মণি-কোঠায় উজ্জ্বল করে রাখি!



নারায়ণচন্দ্র দত্ত

আজ থেকে প্রায় ৩৫/৩৬ বৎসর আগেকার কথা। অখণ্ড ভারতে তখনো ইংরেজশাসন। আজকের আলোক-ঝলমল কলকাতা তখন ছিল না। বড় রাস্তা পেরিয়ে এলেই আর চোখে পড়ত না বিদ্যুতের আলো। ছোটখাট রাস্তায় জ্বলত গ্যাসের বাতি। সন্ধ্যা হলে অলিতে-গলিতে নেমে আসত গা-ছমছম্ আলো আঁধার। শহরের এখানে সেখানে দেখতে পাওয়া যেত চারটে ঝাঁকড়া গাছ ও সেখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকত গাঢ় অন্ধকার। আলো পৌঁছায় নি তখন গ্রামে গঞ্জে, রাতের বেলায় গ্রামগুলি সব তলিয়ে যেত নিথর আঁধার সমুদ্রে।

কলকাতা থেকে অনেক অনেক দূরে বর্তমান বাংলা দেশের এক অতি দূর গাঁয়ে ছিল আমাদের বাস। বাবা ছিলেন ডাক্তার চট্টগ্রামের এক চা বাগানে। থাকতাম সবাই সেখানেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড দাপটে পালিয়ে এসে নিতে হয়েছে আশ্রয় ঢাকা জেলার এইগ্রামের বাড়ীতে। সাময়িক ভাবে এখানেই প্র্যাকটিস করছেন বাবা। আমার বড়দির বিয়ে হয়েছে কলকাতায়, থাকত তাঁরা কালীঘাট অঞ্চলে তারক মিত্র লেনে। হঠাৎ খবর এল বড়দি ভয়ানক অসুস্থ, অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েও ফল হয় নি কিছুই। উদ্বিগ্ন হল বাড়ীতে সবাই। বাবা ছুটলেন কলকাতায়। মা বার বার বলে দিলেন বড়দিকে যেন নিয়ে আসা হয় এখানে। কলকাতায় যার চিকিৎসা হল না, তার চিকিৎসা হবে এ অজ পল্লীতে! সবাই ভাববেন এ পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয়। বাবা কিন্তু মায়ের অনুরোধ রেখে ছিলেন। বড়দিকে নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতা থেকে। স্বাস্থ্য তার ভেঙে গেছে খুব। গায়ের রঙ অদ্ভুত রকম ফ্যাকাসে। নিজে এলোপ্যাথিক ডাক্তার হয়েও সেপথে আর গেলেন না বাবা। ক'দিন ধরে চলল নানা সলাপরামর্শ। তারপর একদিন সন্ধ্যায় এসে হাজির হল রমণী মামা।

এখানে একটু পরিচয় দিই রমণী মামার। আমার নিজের মামার বাড়ী ছিল আমাদের গ্রামেই। ছোট্ট সোঁতা গাঙিনা। তার এপারে 'দণ্ড পাড়া', ওপারে 'মধ্যি পাড়া'। মধ্যি পাড়া প্রায় পুরোটাই ছিল আমার মামাদের। বিরাট আমসুপারির বাগান। তার এক পাশে গাঙিনা, আর এক পাশে দাবার ছকের মত সাজানো পরপর কয়েকখানা পুকুর। বাগানের শেষে মামাদের দালান। ঐ বাগানেরই অপর প্রান্তে গাঙিনার কোল ঘেঁষে ঘর করেছিল রমণী মামা, মামার বাড়ীর বাগানে বাস সেই সুবাদে। মামা করত ছুতোর মিস্ত্রির কাজ। ভাল কাজ জানার জন্য আর অমায়িক ব্যবহারে রমণী মামা প্রিয় ছিল সবার কাছে। হয়ত আরও একটি বড় কারণ ছিল। ঝাড়ফুঁক আর তুক্-তাকে রমণী মামা ছিল সিদ্ধহস্ত। ঐ সময়ে গ্রাম বাংলায় যার প্রভাব ছিল অপরিসীম।

রমণী মামা বাড়ীতে পা দিতেই এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল বড়দির মধ্যে। চোখে কেমন তার অমানবিক চাহনি। মেজাজ খুবই ক্ষিপ্ত। আর কোথা থেকে এক অত্যাশ্চর্য শক্তি ভর করল ঐ দুর্বল দেহে। পাড়া প্রতিবেশী অনেকেই এসেছিল সেখানে রমণী মামার নির্দেশে। বড়দিকে শুইয়ে দেওয়া হল একটি মাদুরে। চার পাঁচজন জওয়ান লোক অর্থাৎ আমার জ্ঞাতি কাকা ও অন্য ক'জন প্রতিবেশী ধরে সামলাবার চেষ্টা করতে থাকল বড়দিকে। আগে থেকেই রমণী মামা যোগাড় করে এনেছিল দুটো শিবড়ের মত জিনিস। ঐ দুটো গুঁজে দেওয়া হল বড়দির নাকে। তখন সেকি পরিত্রাহি চিৎকার আর এক অস্বাভাবিক নাকী কাঁদুনি। এ কান্না কোন মানুষের কান্না নয়। আর বার বার বলছে—"আমায় ছেড়ে দে,তোরা আমায় ছেড়ে দে।"

রমণী মামার প্রশ্ন—'কে তুই বল্ ?'

প্রথমে কিছুতেই সে বলবে না। অনেক ধস্তা-ধস্তির পর বলল—

"বলছি।"

আমরা সবাই উৎকর্ণ হলাম। যা শুনলাম আজও যেন তা বিশ্বাস হতে চায় না। পরিষ্কার ভাষায় বলল —"আমি অমুকের প্রেতাত্মা।"

সব কথাগুলি বড়দির মুখ দিয়েই বেরুচ্ছিল, কিন্তু এ স্বর বড়দির নয়, অন্য কারো।

আবার প্রশ্ন—"তুই কোথায় থাকিস ?"

জবাব—"দুপুরে শীতলাতলায় বটগাছে, সন্ধ্যায় তারক মিত্র লেনে চালতা গাছে, আর রাত্রিতে কেওড়া তলা মহাশ্মশানে।"

এ ঘটনা ঘটবার সময় পর্যন্ত আমি কখনো কলকাতায় আসি নি। পরে ১৯৪৮ সালে কলকাতায় এসে সবই আমি দেখেছি নিজের চোখে তারক মিত্র লেনে বড়দিদের ভাড়া-বাড়ীর খাটা পায়খানার উপরেই ছিল ঝাঁকালো চালতা গাছ। দিনের বেলায়ও যার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলত না। শীতলাতলা আর কেওড়াতলা মহাশ্মশানও সেখান থেকে অনতিদূরে।

আবার প্রশ্ন—"তোর সঙ্গে আর কে কে আছে ?

জবাব—"আমরা তিন জন"। তিনটি নামও বলেছিল। সুস্পষ্ট সে নামগুলো আজও আমার মনে আছে। কিন্তু তা উল্লেখ করলাম না। তবে ঐ তিনটি নামের মধ্যে একটি ছিল আমাদের এক মৃত আত্মীয়ের নাম।

"কেন ধরেছিস ওকে ?"

"সন্ধ্যাবেলায় এলো চুলে আমার কাছে গেল কেন ?"

"তুই ছেড়ে যাবি কিনা বল।"

প্রথমে—"কিছুতেই না।" অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত রাজী করানো গেলো।

এবার রমণী মামা বলল—"জুতো কামড়ে প্রতিজ্ঞা কর আর কখনো আসবি না এখানে।"

কিছুতেই সে রাজী হয় না। নানা অজুহাত দেখায়—"আমি শীতলাতলায় থাকি, কালীঘাটে থাকি, জুতো আমি কামড়াতে পারবো না।"

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওকে কামড়াতেই হল। এর পর বলা হল—"চলে যাবার সময় প্রমাণস্বরূপ তুই ভেঙ্গে রেখে যাবি একটি গাছের ডাল।"

জবাবে বলল—"গাছের ডাল ভাঙ্গতে বললে ঐ গাছেই আমি থেকে যাব।"

তখন আর এ নিয়ে জোর করল না রমণী মামা। বলল—"আচ্ছা তবে এমনি চলে যা।"

ইঙ্গিত করলে সবাই ছেড়ে দিল বড়দিকে। আর ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল বড়দি ঘর থেকে। রমণী মামার নির্দেশে একজন ছুটে গিয়ে তার আঁচল ছুঁয়ে দিতেই বড়দি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

চোখের পলকে ভোজবাজীর মতো কোথায় অন্তর্নিহিত হল তার সেই প্রচণ্ড শক্তি। সবাই ধরে এনে শুইয়ে দিল বড়দিকে বিছানায়। এ এক অন্য মানুষ। অতি দুর্বল অবসন্নদেহ। তারপর কয়েক দিনের সেবাযত্নে সম্পূর্ণ সেরে উঠল বড়দি।

এখন বড়দি তিন ছেলের মা। আজও তারা কলকাতায় থাকে। তবে তারক মিত্র লেনের ভাড়া-বাড়ীতে নয়। ঢাকুরিয়ায় নিজ বাড়ীতে।

রমণী মামা আর নেই। দেশবিভাগের পরে ছিন্নমূল হয়ে সবাই ভেসে গেছে এদিকে ওদিকে। রমণী মামা শেষ পর্যন্ত কিন্তু থেকে গিয়েছিলেন ঐ গ্রামেই। বছর কয়েক আগে শুনেছি রমণী মামার মৃত্যু হয়েছে সেখানেই। দেশের মাটিতে চিরদিনের মত মিশিয়ে গেল রমণী মামা। আর তাকে দেশ ছেড়ে যেতে হল না।

আজকের যুগের পাঠক এ ঘটনার কি ব্যাখ্যা করবে জানি না। হয়তো বলবে আজগুবি। কেউ হয়তো টিটকারী দেবে। কিন্তু কিশোর বয়সে দেখা এ ঘটনা আমার কাছে আকাশের চন্দ্রসূর্যের মতই সত্যি !

আমরা মনে করি

* কোন রাজ্যের আন্দোলনকারীরা ঠিক করতে পারেন না বিদেশী নাগরিক কারা। ঠিক করবেন সরকার জাতীয় ভিত্তিতে সর্বদলীয় মতামত নিয়ে।

* সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা কেউ কোন কারণেই বিঘ্নিত করতে পারেন না। ভারতের নাগরিক হিসাবে যে কোন রাজ্যেই আমরা বসবাস করতে পারি। প্রত্যেকটি রাজ্যেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অধিকার মৌলিক।

* কোন একটি রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ কেবলমাত্র সেই রাজ্যই দাবী করতে পারেন না। ভারতের যে কোন রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার সমস্ত ভারতবাসীর।

জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন

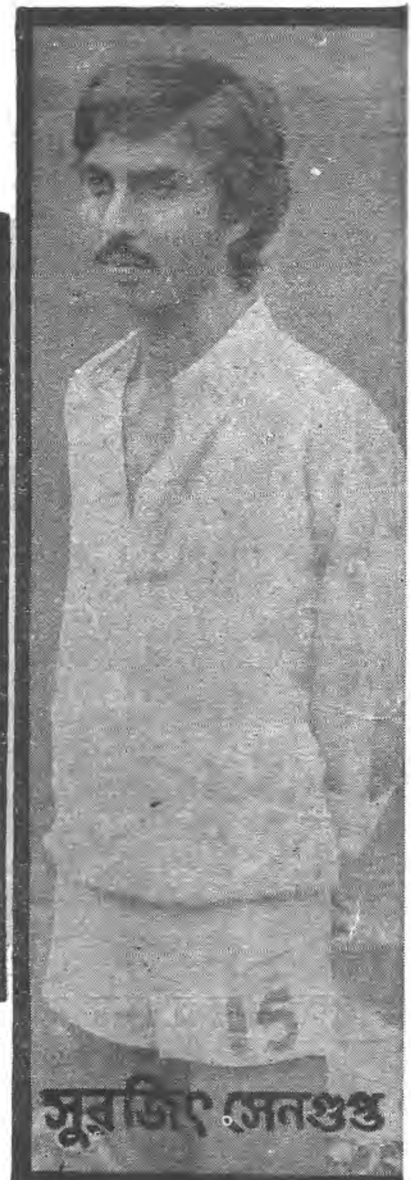
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

POSTAL REGN. No WB/EC-166 JHALMAL AUG-SEPT'80
BHADRA (1387 BS)
N.P. REG. No RN 32832178





তিন প্রধানের তিন সেরা



ছবি - জহর রায়